শিশু-সাহিত্যের সর্ব্বজন-পরিচিত
প্রবীণ লেখক
শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী

এস. গুপ্ত এণ্ড সন্স

৪।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট
শিশু-সাহিত্য পরিষদ হইতে
শ্রীসলিলকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত

আশ্বিন—১৩৪৩
দাম ছয় আনা

"ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও"
কর্ত্তৃক এই পুস্তকের
যাবতীয় ব্লক এবং রঙিন ব্লকগুলি
প্রস্তুত ও মুদ্রিত হইয়াছে

প্রিণ্টার—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভৌমিক
জুবিলী প্রেস
১৪ বৃন্দাবন মল্লিক ফার্ষ্ট লেন
কলিকাতা

উপহার

"পুতুলের মতো ঝুলিয়ে তুলে নিলে"

## এক

পাহাড়-বনে ভরা সাঁওতাল পরগণার ছোট এক সহরে থাকতো এক তাঁতি—বেচারা বড় গরীব। সংসারে তার আপনার জন কেউ ছিল না। হাটের ধারে ছোট একখানি কুঁড়ে ঘরে বসে গাম্ছা বুনতো, আর সেখানকার গরীব গেরস্ত যারা, তারা, কম পয়সায় গাম্ছা কিন্তো তারই কাছ থেকে। তাতেই একলা মানুষের বেশ চ'লে যেতো।

একদিন হাটবারে তাঁতি গাম্ছা বুন্ছে তার দোকানে বসে, এমন সময় এক মেঠাইওয়ালা এসে হাঁক্লে—"নতুন মেঠাই—নতুন মেঠাই—বর্দ্ধমানের সীতাভোগ—চা—ই—ই—?"

তাঁতি আর লোভ সাম্লাতে পারলে না, একপো, সীতাভোগ কিনে রাখলে পাশে, ভাব্লে হাতের কাজটা শেষ করে খাবে।

কিন্তু যেমন না মেঠাই নিয়ে রাখা, অমনি বড়-বড় মাছির ঝাঁক ছুটে এলো ভন্‌-ভন্‌ করে। তাঁতি এক হাত নেড়ে এক একবার তাড়াতে লাগলো, আর তাড়াতাড়ি সারতে লাগলো তার কাজ।

কিন্তু মাছি কি যায় তাড়ানো? যেমন হাতখানা নড়ে অমনি যায় উড়ে, আবার পরক্ষণেই দ্বিগুণ ফ্‌র্তিতে এসে ঘেরে বিষম জোরে ভন্‌-ভন্‌ করে। শেষে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে জায়গাটাকে ভরিয়ে দিলে, জোর ভন্‌ভনানিতে কাণ পাতা যায় না। তাঁতি বুদ্ধি করে একখানা টাট্‌কা মাড়ু-দেওয়া গামছা ঢাকা দিলে।

তাতে হলো হিতে—বিপরীত! একে সীতাভোগের গন্ধ, তার ওপর টাট্‌কা মাড়—আর কি রক্ষা থাকে? দেখ্‌তে-দেখ্‌তে—কাদা-লেপার মতো—মাছিতে গামছাখানা যেন লেপে দিলে!

তাঁতি আর থাক্‌তে পারলে না, হাতের কাজ ফেলে রেখে বিষম রেগে মারলে তার ওপরে এক চাপড়! মাছির ঝাঁক ভন্‌ভনিয়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়্‌লো ঘরে। কেবল দশটা মাছি মরে প'ড়ে রইলো গামছার ওপরে। তাঁতি এক-এক করে গুণে পাশাপাশি তাদের সাজিয়ে রেখে, তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে এসে সেইদিকে চেয়ে খাবার খেতে বস্‌লো।

হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এলো। মাছির জ্বালায়,

সেখানকার সবাই জ্বালাতন, কিন্তু কেউ কোন উপায় করতে পারে না। সে যখন এক চাপড়ে দশটা মাছি মেরেছে, তখন, সে কথা দেশের লোককে জানাতে পারলে, লোকের কাছে তার নাম হবে খুব, সঙ্গে-সঙ্গে তার কারবারও যে না বাড়বে, তাইবা কে বল্লে ? কিন্তু সে কথা সবাইকে জানায় কেমন করে ?

ভাবতে-ভাবতে এক উপায় বা'র হলো। একখানা শাদা গামছাকে লম্বা-লম্বি ছিঁড়ে দু'খানা করে, তার ওপরে লাল রং দিয়ে বড়-বড় হরপে লিখিয়ে আনলে—'এক চাপড়ে দশ সাবাড়'। তারপরে সেই লেখা দুটো সেলাই করিয়ে এঁটে নিলে তার কোর্ত্তার বুকে-পিঠে দু'দিকে। পরের দিন ভোরে উঠে, সেই কোর্ত্তা গায়ে দিয়ে, দোকানে তালা বন্ধ করে, বেরিয়ে পড়্লো বড় সহরের পথে।

# দুই

সূতো কেনবার জন্যে তাঁতিকে মাঝে-মাঝে যেতে হতো বড় সহরে, সেই জন্যে তাকে চিন্‌তো অনেক দোকানদার। তারা তার বীরত্বের কথা শুনে 'বাহবা' দিয়ে, দিলে আরো ক্ষেপিয়ে! তাঁতি তখন সারা জেলাময় নিজের নাম জাহির করবার জন্যে ফূরতি করে সেখান থেকে বরাবর এগিয়ে চল্‌লো। পথে খাবার জন্যে বন্ধু-দোকানীদের জিজ্ঞাসা করে সঙ্গে নিলে—বীরের খোরাক—রুটী আর কাগজ-মোড়া দুটো লম্বা-লম্বা মাখম।

সহরের পরেই সুরু হলো পাহাড়-জঙ্গলের পথ। রোদে হয়রাণ হয়ে একটা ঝোপের আড়ালে তাঁতি একটু জিরোতে বস্‌লো। এদিক-ওদিক চাইতে-চাইতে তার নজরে পড়্‌লো একটা গাছের ডালে ঝুল্‌ছে, লম্বা ঠোঙার মতো, একটা 'দুগ্‌গো-টুন্‌টুনির' বাসা। আর কি থাক্‌তে পারে? তাড়াতাড়ি উঠে পা-টিপে-টিপে গিয়ে দেখলে, একটা ছোট টুনটুনি ডিমে বসে তা দিচ্ছে। তাঁতি পাখীটাকে ধরে কোর্ত্তার এক পকেটে পুরে নিয়ে বরাবর চল্‌লো এগিয়ে।

ক্রোশখানেক পথ যাবার পরে তাঁতি দেখতে পেলে, বনের ভেতরে একটা ছোট পাহাড়ের ওপরে বসে—বিরাট্ চেহারার প্রকাণ্ড এক দৈত্য—বুনো-মানুষ—নীচের দিকে চেয়ে বনের চারদিকে দেখছে। দেখে কিন্তু তাঁতির ভয় হলো না মোটেই, সোজা গিয়ে ঠেলে উঠ্‌লো সেই পাহাড়ে।
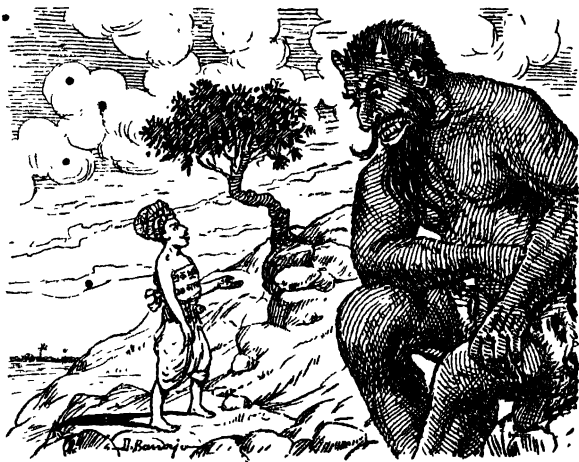
দৈত্য ছোট্ট মানুষটিকে দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। তাঁতি হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্লে—"নমস্কার মশাই, আপনি নীচে চারদিকে চাইছেন দেখে, মনে হলো যে কোথাও যেতে মন করেছেন। আমিও পৃথিবীর দেশ দেখবার জন্যে বেরিয়েছি, কিন্তু সঙ্গী পাইনি, চলুন না—দু'জনে একসঙ্গে যাই?"

দৈত্য দারুণ ঘেন্নায় নাক সিঁট্‌কে চাইলে তার দিকে, তারপরে বাজের মতো গর্জ্জে ধম্‌কে উঠ্‌লো—"থাম্ হতভাগা, একরত্তি মানুষ!"

"একরত্তি মানুষ! বটে? হা—হা—হা—একবার চেয়ে দেখো এই দিকে।" বলে, তাঁতি হাস্‌তে-হাস্‌তে বুক ফুলিয়ে নিজের জামার সেই লেখা দেখিয়ে দিলে।

দৈত্য আশ্চর্য্য হয়ে প'ড়লে—"এক চাপড়ে দশ সাবাড়!" ভাবলে, লোকটা এক চাপড়ে দশজন মানুষকে মেরে ফেলেছে। অম্‌নি অনেকটা ভক্তি এলো তাঁতির ওপরে, কিন্তু সন্দেহের ভাব একেবারে গেলো না। তাই পরীক্ষা করবার জন্যে, পাশ থেকে এক টুক্‌রো ভিজে বেলে-পাথর কুড়িয়ে নিলে, তারপর পাথরটাকে বাঁ হাতের চেটোতে রেখে ডান হাত দিয়ে এমন জোরে রগ্‌ড়ে টিপ্‌তে লাগলো, যে তা থেকে ফোঁটা-কতক জল পড়্‌লো টস্-টস্ করে। দৈত্য তাঁতিকে জিজ্ঞাসা করলে—"পার?"

"ফুঃ—এই?—এ তো কিছুই না।"

বলেই, তাঁতি পাথর কুড়োবার ছল করে হেঁট হয়ে সেই মাখম বার করে নিয়েই হাসতে-হাস্‌তে টিপ্‌লে দুই হাতে। গরমে মাখমটা নরম হয়ে গিয়েছিলো, টিপ্‌তেই ঘি ঝর্‌তে লাগলো টস্-টস্ করে। তাঁতি ফূর্তি করে বলে উঠ্‌লো—"কেমন, তোমার চয়ে বেশী জল, না?"

দৈত্যের ভক্তি বাড়লো, তবুও পূরো বিশ্বাস না করে, আবার

একটা নুড়ি তুলে নিয়ে এমন জোরে ছুড়্লে ওপর দিকে যে চোক থেকে সেটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে, শব্দ করে প'ড়্লো মাটীতে। দৈত্য তাঁতির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"এমনি জোরে ওপর দিকে ছুড়্তে পার তো বুঝি গায়ের জোর ?"

—"বাহবা বটে!" বলে তাঁতি তাকে উৎসাহ দিয়ে, শেষে বল্লে—"কিন্তু, তোমার পাথর তো ফিরে এসে পড়লো মাটীতে, আমি এত জোরে ছুড়তে পারি যে পাথর আর ফিরে পড়বেই না।"

—"বেশ দেখাও।"

—"তবে দেখ", বলে তাঁতি আবার—আগেকার মতো—পাথর কুড়োবার ছল করে, পকেট থেকে টুনটুনি পাখীটাকে মুটো করে নিয়েই ছুড়ে দিলে ওপরের দিকে। পাখীটা কালো দাগটুকুর মতো ওপরে উঠেই—উড়ে আকাশে মিলিয়ে গেলো।

অতি ছোট পাখীটাকে দৈত্য বুঝতেই পারলে না, ভাবলে সত্যিই ছোট. মানুষটি একটা পাথর ছুড়েছে! তার মনে ভক্তি বাড়্লো খুব, তবুও—দৈত্য কি না,—সন্দেহ একেবারে গেলো না। আশ্চর্য্য ভাবে তাঁতির দিকে চেয়ে বল্লে—"হ্যাঁ, এবার আমার চেয়েও ঢের ভালো পাথর ছুড়েছ, তোমার বাহাদুরী বটে! আচ্ছা এবার এসো, দেখা যাক কে কত ভার তুল্তে পারে ?"

কাছেই একটা মস্ত মোটা প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া গাছ—ঝড়ে উপড়ে গিয়ে লম্বা—হয়ে পড়েছিলো। সেইখানে তাঁতিকে নিয়ে

গিয়ে দৈত্য আবার বল্লে—"আচ্ছা এই গাছটাকে কে কতদূর কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে পারে, দেখা যাক।"

"বেশ, তা'হলে তুমিও কাঁধে তোল। দেখ ওই মাথার দিকটা কি বিষম ঝাঁকড়া—গোড়ার দিকটার চেয়ে ঢের বেশী ভারী আর বড়, আমি ওই দিকটাই নিচ্ছি, তুমি গোড়ার দিকটা কাঁধে তুলে নিয়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চল।"

তাঁতির কথায় খুশী হয়ে দৈত্য পেছন ফিরে গাছের গোড়াটা উপড়ে তুলে নিলে কাঁধে। তাঁতিও অমনি গাছের মাথার ঝাঁকড়া ডালগুলোর ভেতরে উঠে বসে বল্লে—"চল ভাই, এইবার পথ দেখিয়ে আগে-আগে।"

দৈত্য পেছন ফিরে ছিলো বলে টের পেলে না, তাঁতিকে সুদ্ধ

বয়ে নিয়ে হন্-হন্ করে পাহাড়-বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চল্‌লো। তাঁতি মনের সুখে বসে সুর ভাঁজতে লাগলো— তাই-রে নারে-না।

দৈত্য আশ্চর্য্য হয়ে মনে ভাবলে—ওঃ, লোকটার কি বিষম গায়ের জোর, এতবড প্রকাণ্ড গাছটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তবুও কষ্ট হচ্ছে না একটুও, মনের সুখে গান গাইছে! তারপরে আধ ক্রোশ গিয়ে আর বইতে না পেরে, ধপ্ করে ফেলে দিলে গাছটাকে। তাঁতিও চোকের পলকে লাফিয়ে নীচে নেমে ডালে হাত দিয়ে দাঁড়ালো।

দৈত্যের গা দিয়ে ঘাম ছুট্‌ছিলো। দেখে, তাঁতি হেসে বল্লে "এঃ— এরই ভেতর হাঁপিয়ে প'ড়্‌লে ভাই—অত বড় বিষম পালোয়ান তুমি! এই দেখ আমার একটুও কষ্ট কি মেহনত হয়নি—হাঃ—হাঃ—হাঃ—!"

তাঁতি মনের সুখে আবার গান জুড়ে দিলে। দৈত্যের মনে আর সন্দেহ রইলো না একটুও, ভক্তিতে মন ভরে গেলো, সরল প্রাণে বলে উঠলো—"আমরা ভাবতুম যে, পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে গায়ের জোর আর কারুর নেই, এখন দেখছি যে আমাদের চেয়ে ঢের বেশী জোর আছে তোমার ওই একরত্তি চেহারার ভেতরে।"

আবার দু'জনে পাহাড়-বনের পথে এগিয়ে চল্‌লো। খানিক দূর যাবার পরেই তাঁতির নজরে পড়্‌লো, প্রকাণ্ড একটা গাব গাছে

বিস্তর হল্‌দে রঙের পাকা গাব ঝুল্‌ছে। দেখেই তার জিভ দিয়ে জল পড়্‌তে লাগলো। ওপর দিকে হাঁ করে চেয়ে বেজায় দুঃখে বলে উঠ্‌লো—"তোমাদের ভারি সুবিধা ভাই, ইচ্ছা হলেই উঁচু গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে পার, আমার কিন্তু সে সুবিধা নেই।"

দৈত্য তার মনের কথা বুঝে অল্প হেসে, হাত দিয়ে গাছের মাথাটা টেনে নামিয়ে পা দিয়ে মাটীতে চেপে রইলো। তাঁতি পাকা গাব খেতে লাগলো পেট ভোরে।

## তিন

হঠাৎ দৈত্যের মাথায় এক খেয়াল এলো। মজা দেখ্‌বার জন্যে ধাঁ করে পা-খানা নিলে সরিয়ে, অম্‌নি তাঁতিকে স্থুদ্ধ নিয়ে গাছটা সোজা হয়ে উঠে গেল ওপরে। হো-হো হেসে দৈত্য বলে উঠ্‌লো—"ছি-ছি-ছি, এই তোমার জোর! গাছটাকে চেপে রাখতে পারলে না? দেখছি সব তোমার ভণ্ডামি।"

তাঁতি মনে-মনে চম্‌কে উঠলো, কিন্তু তখনি তা চেপে বিষম ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো—"আরে সর্ব্বনাশ, শীগ্‌গির—শীগ্‌গির—"

—"কি শীগ্‌গির?"

—"শীগ্‌গির গাছে উঠে পড়, দেখ্‌ছো না—একটা সেপাই এই দিকে তাগ করে বন্দুক ছুড়ছে? তাইতো ওপরে উঠে পড়লুম, নইলে গাছটা চেপে রাখা তো তুচ্ছ কথা। এই ম'লে! বন্দুকের নল ঠিক তোমার মাথায় সোজা—"

"বাপ্‌" বলেই দৈত্য বেজায় ভয়ে তার পেল্লায় শরীর নিয়ে হাঁচড়-পাচড় করে কোন রকমে গাছের মাঝামাঝি উঠে লম্বা দম ছাড়লে। তারই ভেতরে তাঁতি দুটো কাঁচা গাব ছিঁড়ে নীচের পাহাড়ে জোরে-জোরে আছাড় মেরে বলে উঠলো—

—"শুনলে তো আওয়াজ—দু'দুটো গুলি এসে পড়্‌লো ঠক্‌-ঠক্‌ করে। আর একটু হলেই গিয়েছিলে! আর বল কিনা আমার ভণ্ডামি?"

শব্দ দুটো দৈত্যের কানে গিয়েছিলো, ভয়ে কেঁপে আম্‌তা আম্‌তা করে বল্লে—"কিছু মনে করোনা ভাই, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, তাই ঠাট্টা করছিলুম, রাজার সেপাইরা মাঝে-মাঝে আমাদের খোঁজ করতে এইদিকে আসে, ভাগ্যে আজ তুমি সঙ্গে ছিলে! এখন তো সন্ধ্যা হয়ে এলো, খানিক দূরে একটা পর্ব্বতের গুহাতে আমরা থাকি, সেখানে আমার আরো দু'কুটুম আছে। চল, রাত্তিরে সেইখানে থাকতে তোমার কোন ভয় নেই।"

তাঁতি একেবারে দু'পাটি দাঁত বা'র করে হো-হো করে হেসে বল্লে—"ভয়! দেখ্‌ছো তো এই লেখা? ভয় আমার দুনিয়াতে কারুকে নেই, নইলে একলা বেরোতে ভরসা করি? চল-চল তোমার ঘরে যাই।"

গাছ থেকে নেমে দু'জনে খানিক দূর গিয়ে ঢুক্‌লো একটা পর্ব্বতের গুহার ভেতরে। তাঁতি দেখলে আরো দু'জন তেমনি ভয়ানক চেহারার প্রকাণ্ড দৈত্য—গুহার মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে বসে—এক একটা আস্ত ছাগল ঝল্‌সে খাচ্ছে।

দৈত্য তাদের কাছে তাঁতির অসম্ভব গায়ের জোরের কথা গল্প ক'রে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে, তারপরে তাকে পেট ভরে

খাইয়ে, তফাতে একটা প্রকাণ্ড বিছানা দেখিয়ে দিয়ে বল্লে,—"ওই বিছানাতে শুয়ে ঘুমোও গিয়ে।"

বিছানাটা যেমন প্রকাণ্ড তেমনি আব্ড়ো-খাব্ড়ো—উঁচু-নীচু, দেখে, তাঁতি কিন্তু তাতে শুলো না। চুপিসাড়ে উঠে গুহার এক অন্ধকার কোণে গিয়ে একখানা চামড়া পেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্লো। দৈত্য তিনজন সেই আগুনের কাছে বসেই গল্প করতে লাগলো।

কিন্তু মাঝ-রাত্তিরে একজন উঠে প্রকাণ্ড একটা মুগুর নিয়ে সেই বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বিছানার মাঝখানটা উঁচু দেখে ভাবলে—তাঁতিতো ঘুমোচ্ছে। আর যায় কোথায়? মুগুরটা মাথার ওপর তুলে ঘুরিয়ে, বিষম জোরে-জোরে মারলে পাঁচ-সাত ঘা। তারপরে হাস্তে-হাস্তে আগুনের কাছে ফিরে গিয়ে সেই খবর দিলে। তখন তিনজনে নিশ্চিন্তি হয়ে সেইখানেই শুয়ে ভোঁস্-ভোঁস্ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলো।

এদিকে, সকাল হতে তাঁতি ঘুম ভেঙ্গে উঠে গিয়ে আগুনের কাছে বসে খানিকটা মাংস বেছে নিয়ে সিদ্ধ করে খেতে আরম্ভ করলে। সেই শব্দে দৈত্য তিনজন জেগে ধড়মড়িয়ে উঠে, তাঁতিকে দেখেই যেন আকাশ থেকে পড়লো! কিন্তু সে ভাব চেপে রেখে আগেকার দৈত্য জিজ্ঞাসা করলে—"কি বন্ধু, রাত্তিরে কেমন ঘুমিয়েছ বল?"

তাঁতি হেসে জবাব করলে—“এমন চমৎকার ঘুম আর কখনো ঘুমোইনি, পরম আরামে রাত কেটেছে।”

দৈত্য আবার জিজ্ঞাসা করলে—“কোন কিছুর উৎপাত টের পাওনি তো ?”

—“হ্যাঁ-হ্যাঁ—ঠিক, খানিক রাত্তিরে একটা ব্যাং কি ইদুঁর গায়ের ওপর লাফালাফি করেছিলো বটে, কিন্তু তাতে আর আমার কি হবে বল ? হাঃ—হাঃ—হা—”

তাঁতির কথা শুনে দৈত্যেরা বেজায় আশ্চর্য্য হয়ে তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। সকলেই ভাবলে—বাবারে, না জানি কি সর্ব্বনেশে মানুষ ! ভয়ে তিনজনেরই বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগলো। তারপরে ছুতো করে গুহা থেকে বেরিয়ে কোথায় পালালো তার আর ঠিকানা রইলো না। তাঁতিও পেট ভরে খেয়ে নিয়ে, সেখান থেকে বেরিয়ে বরাবর চল্‌লো এগিয়ে। শেষে বন পার হয়ে পড়্‌লো গিয়ে এক রাজার রাজধানীতে।

রাজপথে নানা রকম লোক যাওয়া-আসা করছিলো। তাঁতির বুকে-পিঠে সেই—‘এক চাপড়ে দশ সাবাড়’—লেখা দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে সেই কথা বলাবলি করতে লাগলো। ক্রমে কথাটা উঠলো গিয়ে রাজার কাণে।

রাজার একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আর অন্য সন্তান ছিল না, তার ওপর নিজেও বুড়ো হয়ে পড়েছিলেন। সেই সুবিধা পেয়ে অস্তু

জন-দুই রাজা যুদ্ধ করে—তাঁকে মেরে—রাজ্যটা কেড়ে নেবার চেষ্টায় ছিলেন। সেই জন্যে রাজা খুঁজ্‌ছিলেন একজন খুব জবর্‌দস্ত বীরকে—তাঁর সৈন্যের দলে নেবার জন্যে।

খবর শুনে তাঁতিকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে, সেই লেখা প'ড়ে রাজা বেজায় খুসী হলেন। তখনি তাকে একেবারে প্রধান সেনাপতি করে দিয়ে, থাকবার জন্যে বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, চাকর-বাকর—যা কিছু দরকার—সব কিছু ব্যবস্থা করে দিতে বাকী রাখলেন না।

## চার

কিন্তু হিতে হলো বিপরীত। একজন অচেনা অজানা বিদেশী লোককে একেবারে অতবড় হতে দেখে রাজার অন্য সেনাপতিদের হলো রাগ। তারা সকলে মিলে এক জোট হয়ে কাজ ছেড়ে দিতে চাইলে।

রাজা পড়লেন বিষম ফাঁপরে। পুরানো সেনাপতিদের ছেড়ে দিতে তাঁর মন সরলো না। ওদিকে যে মহাবীর এক চাপড়ে দশ জন মানুষকে মেরে ফেলেছে, তাকে একবার কাজে ভরতি করে, আবার বিনা কারণে জবাব দিলে, সে অপমান মনে ক'রে, যদি বিদ্রোহ করে, তখন তার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? রাজার ভাবনার অন্ত রইলো না।

অনেক ভেবে রাজা এক মতলব বার ক'র্লেন। কিছু-দিন আগে থেকে দু'জন বিরাট চেহারার ভয়ানক দৈত্য এসে তাঁর রাজধানীতে বিষম উপদ্রব করতে সুরু করেছিলো। রাজার সেনাপতিরা বারবার সৈন্য নিয়ে গিয়েও তাদের কিছুই করতে পারেনি। সেই থেকে তাদেরও অত্যাচার এমন বেড়েছিলো যে লোকে রাত্তিরে ঘরের বাইরে বেরোতেও ভরসা ক'রতো না।

রাজা, তাঁতিকে ডেকে, সেই দুজন দৈত্যকে মেরে ফেল্‌তে হুকুম ক'রে, জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন পারবে তো ?"

তাঁতি অগ্রাহ্য করে বল্লে—"কি ব'লছেন মহারাজ, এ তো অতি তুচ্ছ কথা। এক ঘুষোতেই দু-ব্যাটাকে দেব শেষ করে।"

"এঁ্যা—বল কি ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ মহারাজ, যদি পারি তো কি পুরস্কার দেবেন ?"

রাজা ভাবলেন, লোকটা দৈত্য-দুটোকে দেখেনি ব'লে এতো অহঙ্কার করছে, তাদের দেখ্‌লে হয় পালাবে, নয় তো তাদের হাতে মারা যাবে নিশ্চয়। তাই ফূরতি করে বল্লেন—

"তা যদি পার তো, রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো, আর, আমার পরে তুমিই হবে এ দেশের রাজা।"

"যো হুকুম, আমি একলাই দু-ব্যাটাকে শেষ করে দেবো—এখনি চল্লুম।"

ব'লে, তাঁতি রওনা হতে গেলো, কিন্তু রাজা একশো সেপাই দিলেন সঙ্গে। বনের মুখে গিয়ে তাঁতি সেপাইদের বল্লে—"তোরা এইখানে থাক্, আমি দু-ব্যাটাকে মেরে আনছি।"

বনে ঢুক্‌তে সেপাইদের বুক কাঁপছিলো, সেনাপতির হুকুম শুনে বেঁচে গেলো ; তারা সেইখানে রইলো, তাঁতি একলা গিয়ে ঢুক্‌লো বনের ভেতরে। তারপরে দু'পকেট ভরে নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে, ভয়ে-ভয়ে পা টিপে-টিপে, বনের এদিক-ওদিক ঘুর্‌তে লাগলো দৈত্য দু'জনের খোঁজ ক'রে।

খানিকক্ষণ ঘোরবার পরেই তাঁতির নজরে প'ড়্‌লো—একটা মস্ত বড় ঝাঁক্‌ড়া গাছের গোড়ায়, চিৎ হয়ে শুয়ে, দু'জন দৈত্য নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। সে তেম্‌নি নিসাড়ে পা-টিপে-টিপে গিয়ে, চড়ে বস্‌লো সেই গাছের ওপরে। তারপরে পকেট থেকে একটা নুড়ি বার করে নিয়ে—তাগ্‌ করে—খুব জোরে মার্‌লে একজনের নাকের ওপরে ঠক্‌ করে।

দৈত্য ধড়্‌মড়িয়ে জেগে উঠেই, পাশের দৈত্যকে ঠেলে জাগিয়ে দিয়ে, রেগে বলে উঠ্‌লো—"কেনরে আমাকে মার্‌লি?"

সে দৈত্য হো হো করে হেসে জবাব ক'রলে—"আমি তো ঘুমোচ্ছিলুম, তোকে মারলুম কখন? তুই স্বপ্ন দেখছিস্‌।"

আর কথা কাটাকাটি না করে, দু'জনেই আবার ঘুমুলো। একটু পরে তাঁতি আবার একটা নুড়ি বার করে নিলে, তারপরে জোরে মারলে দ্বিতীয় দৈত্যের নাকে। সে তখুনি তিড়্‌বিড়িয়ে উঠে, ধাক্কা দিয়ে প্রথমকে জাগিয়ে, বলে উঠ্‌লো—"ছাখ্‌ তোর ভারি অন্যায়, আমি বল্লুম তোকে মারিনি—সে কথা বুঝি বিশ্বাস করলি না, যেমন ঘুমটি ধরেছে, অমনি মারলি আমাকে? এবারে কিন্তু ভাল হবে না।"

"ভালোরে ভালো, ও কথা তো আমিই তোকে বলেছিলুম, তারপরেই ঘুমিয়েছি। এবার তুই স্বপ্ন দেখেছিস্‌। ফের যদি সুদু-সুদু অমন করিস্‌ তো, আমিও বলে রাখ্‌ছি—ভাল হবে না কিন্তু!"

আবার দু'জনে শুয়ে ঘুমুলো। তাঁতিও খানিক পরে দুটো নুড়ি বার করে নিয়ে, বিষম জোরে-জোরে মারলে ঠক্-ঠক্ করে দুজনকারই মুখের ওপরে।

আর যায় কোথায়? দু'জনেই জেগে লাফিয়ে উঠলো একেবারে তিড়বিড় করে, তারপরেই, না কথা—না বার্ত্তা—দু'জনে তেলে-বেগুনে জ্বলে গিয়ে পড়লো যমের মতো দু'জনকার ওপরে! লাথি, ঘুষো, চাপড়, আঁচড়-কামড়, জড়াজড়ি হুটোপাটিতে গাছের ডাল-পালা ভেঙ্গে, ধূলো উড়ে অন্ধকার হয়ে গেলো জায়গাটা!

তবু কি সে যুদ্ধ থামে! শেষে, দু'জনেই ছুটে গিয়ে আন্‌লে দুটো আস্ত-আস্ত গাছ উপ্‌ড়ে, তারপরে সেই গাছ নিয়ে মারামারি—পেটাপিটি করতে-করতে, ঘণ্টাখানেক পরে, দু'জনেই মরে পড়লো সেইখানে। তাঁতির ফূর্‌তি দেখে কে! সে তখন গাছ থেকে নেমে, তাড়াতাড়ি দু'জনের বুকে জোর করে তার তলোয়ার-খানা একবার করে বসিয়ে দিয়ে, টেনে আবার বার করে নিলে, তারপরে এমন বিকট চেঁচিয়ে বন তোলপাড় করে দিতে লাগলো যে, সেই চীৎকার শুনে সেপাইরা আর থাকতে না পেরে, ছুটে এসে সেইখানে জড়ো হলো। তাঁতি বুক ফুলিয়ে বল্লে—"ত্থাখ্ সবাই, আমার যে কথা—সেই কাজ কি না? এই তলোয়ারের এক ঘায়ে দু'ব্যাটাকে শেষ করে দিছি। এখন তোরা দু'জন ছুটে গিয়ে রাজাকে খবর দে,

আর সবাই মিলে এদের মুণ্ডু দুটো কেটে নিয়ে চল্, রাজবাড়ীর ফটকে টাঙিয়ে রাখবো।”

দু’জন তখুনি ছুটে চলে গেলো। সেই খবর শুনে দেশসুদ্ধ লোক ছুটে এসে অবাক হয়ে দেখলে যে, সেনাপতি একলা যাদের

মেরেছে, তাদের শুধু মুণ্ড দুটো কাটতেই আটানব্বই জন যোয়ান সেপাই হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছে!

সেই কাণ্ড দেখে কারুর মনে আর কোন রকম সন্দেহ কি হিংসা, কি খোঁচ, রইলোনা। যারা তার জন্যে কাজ ছাড়তে চেয়েছিলো, তারাই খোসামোদী করে তাকে মাথায় তুলে নিয়ে

নাচতে লাগলো। রাজার আর ভাবনা রইলোনা, তিনি কথা-মতো রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে গেলেন। কিন্তু তাঁতি বাধা দিয়ে বল্লে,—

"না মহারাজ, আপনি উপযুক্ত রাজপুত্তুরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিন, আমি বীর হলেও চাকর—ছোট জাত! রাজ-কন্যাকে বিয়ে করে তাঁর মান নষ্ট ক'রতে পারবোনা। আমি সারাজীবন যাতে এই কাটামুণ্ডের দেশে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারি, সেই ব্যবস্থা করে দিলেই খুশী হবো।"

রাজা পরম আহ্লাদে তাকে গুরুর আদরে রাখলেন। দেশ-বিদেশে তাঁতির বীরত্ব আর মহত্ত্বের কথা রটে যেতে বাকী রইলোনা। কত লোক যে নানা দেশ-দেশান্তর থেকে এসে ফটকে ঝোলানো দৈত্যদেব কাটামুণ্ড দেখে যেতে লাগলো তার আর নিকেশ রইলো না। রাজার শত্রুরাও, সেরাজ্য কেড়ে নেবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে যেতে লাগলো, আর সেই সঙ্গে সেই দেশের নাম হয়ে গেলো—কাটামুণ্ডের দেশ!

---

## এক

হিমালয়ের ওপার থেকে 'হূণেরা' এসে প্রথম যখন ভারতবর্ষের উত্তর দিকটা জয় ক'রে রাজত্ব করতে আরম্ভ ক'র্‌লে তখন সে অঞ্চলে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম 'শিলাদিত্য'।

শিলাদিত্য বৌদ্ধ-রাজা—খুব শান্ত-শিষ্ট, ধার্ম্মিক, তাঁর রাজ্য খুব বড় না হলেও, প্রজারা সকলেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম নিয়ে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতো। কিন্তু হূণেরা সে দেশ জিতে নেবার পর থেকে তাদের সে সুখ-শান্তি আর রইলো না। হূণেরা আগুনের পূজো ক'রতো, রাজা হয়েই হুকুম করলে—সে রাজ্যের সকলকেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে রাজার ধর্ম্ম নিতে হবে—আগুনের পূজো ক'র্‌তে হবে, যে তা না করবে, তার হবে প্রাণ-দণ্ড।

রাজার ভয়ে, দেখ্‌তে-দেখ্‌তে দেশ সুদ্ধ সকলেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে আগুনের পূজো সুরু করলে। বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের—সন্ন্যাসীদের—মঠ, আশ্রম উঠে গিয়ে, সেই সব জায়গাতে হলো, আগুনের পূজো করবার জন্যে বড় বড় উঁচু-উঁচু বেদী, বেদীর ওপরে

—বড়-বড় প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ধুনুচিতে দিন-রাত আগুন জ্বল্‌তে

লাগ্‌লো। রাত্রে সেই সব জ্বলন্ত আগুনের উজ্জ্বল ছটায়

লোকের মনে একটা নতুন জীবনের সাড়া জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তবুও, ধর্ম্ম ছাড়্‌লে না কেবল বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের একটা নতুন দল।

সেই দলে ছিল আঠারো জন ভিক্ষু—সন্ন্যাসী, তারা সকলেই যুবক, সুপুরুষ, বড় ঘরের ছেলে। ধর্ম্মের ওপর তাদের এমন টান আর বিশ্বাস ছিলো যে, সর্ব্বস্ব গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিয়ে, ফকির হয়ে, দলটি করেছিলো মানুষের সেবা করবার জন্যে।

রাজার অন্যায় হুকুম শুনে তারা এক গভীর রাত্তিরে লুকিয়ে পালিয়ে গেলো হিমালয়ের এক নিরালা আনাড় গুহাতে, তারপরে পূর্ণিমার রাত্তিরে সকলেই একমনে ধ্যানে বসে, ক্রমে এমন সমাধিতে—গভীর ঘুমে—ডুবে গেলো যে, বাইরের জ্ঞান আর তাদের কিছুই রইলো না।

ওদিকে, তাদের খোঁজ করে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে, রাজা দলে-দলে সেপাই-সান্ত্রী পাঠাতে লাগলেন রাজ্যের চারদিকে। এমন কি, হিমালয়ের ভেতরে লোক পাঠাতেও বাকী রাখলেন না। কিন্তু কেউ কোথাও তাদের সন্ধান পেলে না।—একদল সেপাই সেই গুহার মুখ পর্য্যন্ত গিয়ে, শাদা রঙের আশ্চর্য্য চেহারার এক রকম সিঙ্গীর—সিংহের—তাড়া খেয়ে, পালিয়ে এলো। আর এক দল গিয়ে, সাংঘাতিক সাপের ছোবলে প্রাণ দিলে।

রাজা তবুও ছাড়লেন না, শেষে এক বীর সেনাপতির সঙ্গে বিস্তর বাছাই করা সৈন্য দিয়ে পাঠালেন সেই গুহাতে খোঁজ

করবার জন্যে। কিন্তু দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—কেটে গেলো, তাদের যে কি হলো, তা কেউ বল্‌তে পারলে না। শেষে বছরও হয়ে গেল পার। রাজা তখন নিরাশ হয়ে সেই আঠারো জন বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর খোঁজ করা ছেড়ে দিলেন।

'সিংহের তাড়া খেয়ে পালালো এবং সাপের ছোবলে প্রাণ দিলে।'

এদিকে, গুহার ভেতরে তারা নিসাড়ে ঘুমিয়ে রইলো সমাধিতে ডুবে। পৃথিবীর ওলোট-পালটেও আর তাদের ঘুমও ভাঙ্গ্‌লো না—সমাধিও ঘুচলো না। ক্রমে একটি দুটী ক'রে দেড়শো বছর কেটে গেলো সেই ভাবে, তারা তার কিছুই জানতে পারলে না।

## দুই

দেড়শো বছর পরে, হঠাৎ এক ভোরে হিমালয় পাখীর গানে মেতে উঠ্‌লো! গলানো সোনার স্রোত ঢেলে দিয়ে সূর্য্য হাস্‌তে লাগলেন আকাশে। বরফে-ঢাকা হিমালয় শিখরে-শিখরে সোনার তাজ পরে, বুকে-বুকে সোনার হার দুলিয়ে, রাজার রাজা—সম্রাট হয়ে তলব ক'র্‌লেন প্রজাদের। অম্‌নি পশুর দল যে যেখানে ছিলো, তারা চারদিক থেকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আহ্লাদে ছুটোছুটি—লাফালাফি—ঝাঁপাঝাঁপি সুরু করে দিলে। দেখাদেখি, ফুলের দলও গন্ধ ঢেলে দিলে বাতাসে। অমনি, রূপে—রসে—গন্ধে—গানে হিমালয় ভরে গেলো।

সেই বিরাট আনন্দের সাড়ার ভেতরে হঠাৎ সেই আঠারো জনেরই সমাধি ঘুচে গেলো—ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তাদের মনে হ'লো, মাত্র একটা রাত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছে। একজন বল্লে—"দয়াময় বুদ্ধদেবের আশীর্ব্বাদে একটা রাত আমাদের নিরাপদে কাট্‌লো।"

আর এক জন বল্লে—"তাঁর দয়ায় এখানে আমরা বেশ থাকতে পারবো, নিষ্ঠুর রাজার লোকেরা এ জায়গার সন্ধান পাবে না।"

তৃতীয় সন্ন্যাসী বল্লে—"আর যদিই বা পায়, তাতেই বা কি ? রাজা গর্দ্দানা নেবে—নিক্ ! যাঁর নাম নিয়ে সংসার ছেড়েছি তাঁর নাম ভুলবো না—ধর্ম্ম ছাড়বোনা কখনই।"

"নিশ্চয়—নিশ্চয় !" ব'লে সকলেই এক সঙ্গে জোর গলায় সায় দিলে। তারপরে আর একজন বল্লে—

"কিন্তু ভাই, এখানে থেকে তো ভিক্ষায় যেতে হবে আমাদের সকলকেই সহরে। আমরা সবে মাত্র পালিয়ে এয়েছি দুটো দিন, রাজার লোককরা নিশ্চয়ই ঘুরছে চারদিকে নজর রেখে। সকলে একসঙ্গে বেরোলেই ধরা প'ড়্বো, তার উপায় কি করা যায় ?"

তখন সকলে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলে যে—একজন ছদ্মবেশ পরে সহরে গিয়ে খবর নিয়ে আসবে, আর সেই সঙ্গে কিছু খাবার জিনিসও কিনে আনবে সপ্তাহ খানেকের মতো, তারপরে সহরের অবস্থা বুঝে সবাই মিলে আবার ভিক্ষায় বেরোবো সাত-আট দিন পরে থেকে।

পরামর্শ মতো, সেই দিনেই একজন ছদ্মবেশ পরে সাজ্‌লে এক গণককার, তারপরে খাবার-দাবার কেনবার জন্যে দুটো মোহর মাথার পাগড়ীর ভেতরে নিয়ে, গুহা থেকে বেরিয়ে চল্‌লো তাদের 'বোধ্‌সমন্দর' সহরে।

কিন্তু পাহাড়-বন ছাড়িয়ে সহরের পথে খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে গণককার থম্‌কে দাঁড়ালো, তার কেবলই মনে হতে লাগলো —এ যেন তাদের সে সহর নয়, চারদিকের সবই যেন কেমন

নতুন-নতুন—অচেনা—অজানা! পথ ভুল হয়েছে ভেবে, দাঁড়িয়ে চারদিকে ভালো করে দেখলে, কিন্তু আর কোন দিকে অন্য কোন পথ দেখতে না পেয়ে, সেই পথ দিয়েই বরাবর চল্লো এগিয়ে। শেষে সহরে ঢোকবার মুখে গিয়ে আর তার পা উঠ্‌লো না, একেবারে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে, চাইতে লাগ্‌লো ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে চারদিকে।

দেশটার তিন দিক পাহাড়-বনে ঘেরা, আর পূবের দিকে মস্ত উঁচু পাথরের পাঁচীলের মাঝখানে—সহরে ঢোক্‌বার প্রকাণ্ড ফটক। ফটকের বাইরে বিশাল 'বোধ্‌সমন্দর' দীঘি, তা থেকেই সহরেরও নাম হয়েছে—'বোধ্‌সমন্দর'। গণককার ফটকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখ্‌লে, দলে-দলে বৌদ্ধ-ভিক্ষু দীঘিতে স্নান করছে, কেউ বা স্তব করছে, আবার কেউ বা মনের আনন্দে গান ধরেছে—

জয় জয় বুদ্ধদেব—জয় জয় জয়!
কিশোর—করুণানিধি জ্ঞানের আলয়॥

## তিন

স্বপ্ন—স্বপ্ন—নিশ্চয় স্বপ্ন! গণককার নিজের চোককে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারলে না, ভাবলে—যা দেখছে সবই স্বপ্ন! নইলে, যে বিদেশী হূণ-রাজা দেশ জয় করে বুদ্ধের নাম পর্য্যন্ত লোপ করে দেছে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মাথা কেটে পথের ধারে ঝুলিয়ে রেখেছে, মঠ আশ্রম ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে আগুনের পূজো করবার বেদী করেছে, যার ভয়ে তারা আঠারো জন মাত্র দুটো দিন আগে পালিয়ে গিয়ে হিমালয়ের গুহাতে লুকিয়ে আছে, সেই হূণ রাজার রাজ্যে এ কী ব্যাপার? এ তো তার রাজ্য হতেই পারে না—এ নিশ্চয় কোন বৌদ্ধ-রাজার দেশ! তা হ'লে পথ হারিয়ে কোন্ দেশে এসে পড়লো সে?

জন দুই লোক নেয়ে উঠে সহরে ঢুক্‌তে যাচ্ছিলো, দেখেই সে ডাক্‌লে—"ও ভাই, শোন—শোন।"

তারা কাছে এসে ব্যাজার হয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"শীগ্‌গির বল কি চাও? আবার এখুনি ফিরে গিয়ে নাইতে হবে সুধু তোমার জন্যে!"

"কেন—কেন—আমি কি করলুম?"

"এই যে ডাক্‌লে, আবার করবে কি ?"

"সেটা কি এ দেশে অপরাধ না কি ?"

"অপরাধ নয় ?—বিষম অপরাধ ! আমাদের মঠের নিয়ম, নেয়ে উঠে আগে বুদ্ধদেবের নাম গান না করে, কারুর সঙ্গে একটিও কথা বল্‌বার যো নেই।"

"আমি তা জানবো কেমন করে ?"

"নাঃ—কিছুই জান না ! বুড়ো মিন্‌সে কোথাকার, খালি নিজের কথাই ষোল কাহন কইচেন ! সুধু-সুধু ডেকে আবার আমাদের স্নান করালে হে ? চল—চল, হতভাগা নচ্ছার কোথাকার !"

"গণককার গুলোর দশাই ওই !" ব'লে দ্বিতীয় লোকটা প্রথমের কথাতে সায় দিলে। তারপরে দু'জনেই তার দিকে কট্‌মট্ করে চাইতে-চাইতে আবার ফিরে গেলো দীঘিতে। বেচারা অবাক হয়ে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো।

তারপরে, একজন গেরস্ত ভদ্দর লোক যাচ্ছিলো সহরের বাইরে, সে কাছে আসতেই, গণককার ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা মশাই, এটা কোন্ দেশ—নাম কি ?"

লোকটা আশ্চর্য্য হয়ে তার মুখের পানে চাইলে, তারপরে একটুখানি কি ভেবে, হেসে বল্লে—"দেখ্‌ছি তো গণককার, নিজেই গুণে বল না—এটা কোন্ দেশ !"

"কি জানি মশাই, আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।"

"ওঃ—বুঝেছি, সকালে উঠেই ভোরপুর ভাং চড়িয়ে বেশ মস্‌গুল্ হয়ে আছ দেখ্‌ছি, সাবাস্ গণককার !"

ব'লে, হাস্‌তে-হাস্‌তে লোকটা নিজের কাজে চলে গেলো। গণককার একেবারে হতভম্ব হয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে একজন মেয়েমানুষ সহরে ঢুক্‌ছিলো মালা আর চন্দন নিয়ে। দেখে, ভরসা করে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—

"ওগো বাছা, একটু দাঁড়াও—দাঁড়াও, আমাকে দয়া করে বল না—এটা কোন দেশ গা ?"

মেয়েমানুষটির স্বভাব একটু খর্‌খরে, সে তার মুখের সাম্‌নে হাত নেড়ে খর্ খর্ করে বল্লে—"তুমি আগে বল তো, কোন দেশের মানুষ গা ?"

"আ—আ—আমি—আমি বোধ্‌সমন্দরের লোক।"

মেয়েমানুষটি হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়্‌লো, তারপরে একটু দম নিয়ে তেমনি হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্লে—"এটা তবে আর কোন্ দেশ গা ? আহা তোমার বুঝি বাড়ীতে মা-বাপ কেউ নেই গা—আহা একলা পথে ছেড়ে দেছে গা—আহা মাথার ঠিক নেই গা—কেমন করে ঘরে ফির্‌বে গা—"

বলে, তেমনি হাস্‌তে-হাস্‌তে তার দিকে ফিরে চাইতে-চাইতে চলে গেলো। গণককার তার কথা শুনে আর রঙ্গ দেখে একেবারে কাঠের পুতুলের মতো থ হয়ে রইলো দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ ফটকের সান্ত্রীর নজর প'ড়্‌লো তার দিকে, হাতছানি

দিয়ে কাছে ডেকে, জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"তোম্ কোন্ রে, এ্যায়সা খাড়া হ্যায় কাহে কো ?"

"হ্যাঁ বাবা, এটা কোন দেশ বাবা—রাজার নাম কি ?"

"এ তো বোধ্‌সমন্দর, তোম কেয়া বাওরা হ্যায়—মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কা নাম শুনা নেহি ? তাজ্জব কা বাত !"

## চার

সান্ত্রীর কথা শুনে গণক্কারের যে টুকু বা জ্ঞান ছিলো, তা কর্পূরের মতো উপে গেলো, মাথায় হাত দিয়ে রাস্তার ওপরে ধপ্ করে বসে পড়্লো। তার কেবলই মনে হতে লাগ্লো, পৃথিবী কি ওলোট্-পালট্ হয়ে গেছে দুটো দিন আর একটা রাত্তিরের ভেতরেই ?

না—দেশটা বোধ্ সমন্দরের মতো দেখ্তে হলেও সে দেশ কখনই নয়, নইলে সে ভূপ রাজা গেল কোথায় ? সাতপুরুষেও কেউ কখনো যে নাম শোনেনি, বলে কি না রাজার নাম—তাই—হর্ষবর্দ্ধন ! নাঃ—এ সবই মিছে, নিশ্চয় স্বপ্ন ! সে স্বপ্ন দেখ্ছে—ঘুমের ঘোর তার এখনো ভাঙ্গেনি।

হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এলো, ভাবলে—দেখা যাক্ পরখ করে ঘুমিয়ে না জেগে ? রাস্তা দিয়ে জনকতক ছেলে যাচ্ছিলো খেল্তে, তাদের ডেকে বল্লে—"ভাই সব শোন, শোন, তোমরা আমার হাতের এই আঙ্গুল কটা একবার কামড়াও তো ?"

বলেই ডান হাতখানা দিলে বাড়িয়ে। ছেলের দল কিন্তু ভরসা পেলে না, আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইলো। সে আবার বল্লে—"আরে কাম্‌ড়াও—কামড়াও, একবার কাম্‌ড়ে আমার একটু উপকার করনা—ঘুমটা ভেঙ্গেই যাক্, স্বপ্ন ঘুচুক, পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারি। নাও, কাম্‌ড়াও—কাম্‌ড়াও!—"

ছেলের দল মজা পেলে, পাগল ভেবে বল্লে—"কিন্তু তুমি তো ফিরে পাল্‌টা কাম্‌ড়াবে না?"

"আরে না—না—কাম্‌ড়াও, পরখ করে দেখি।"

আর যায় কোথায়? ছেলেরা তো একে পায় আরে চায়!

সবাই মিলে, সুধু আঙ্গুলই নয়, যে যেখানে পারলে কাম্ড়ে ধর্‌লে এমন জোরে যে, রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌লো ঝুঁজিয়ে, গণককারও যাতনায় চেঁচাতে-চেঁচাতে নাচতে লাগ্‌লো তিড়িং তিড়িং করে, আর বল্‌তে লাগ্‌লো—"আরে ছাড়্—ছাড়্—ছাড়্—ঘাট্ হয়েছে আমার—ছেড়েদে।"

আর ছেড়েদে! তখন সে কথায় আর কাণ দেয় কে? গণককার যাতনায় যত চেঁচায়, ছেলের পালও ততই মজা পেয়ে হাততালি দিয়ে কামড়াতে থাকে জোরে জোরে! ব্যাপার দেখে, শেষে, সান্ত্রী তাদের তাড়া করে দিলে হাঁকিয়ে। কিন্তু একে হলো আর! ছেলেরা গিয়ে পাড়ার সব ছেলেদের ডেকে এনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইলো।

এদিকে, লোকটার সুন্দর চেহারা, সরল ভাব আর পাগ্‌লাটে ধরণ দেখে সান্ত্রীর মনে দয়া হয়েছিলো। বেলা অনেক বেড়েছে দেখে, তাকে খাওয়াবার জন্যে, সঙ্গে করে নিয়ে চল্লো—রাজার অতিথিশালাতে।

আর যায় কোথায়? রাস্তার চারধার থেকে অমনি পালে-পালে ছেলে বেরিয়ে, দু'জনকে ঘিরে, হাততালি দিতে দিতে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগলো—

পাগ্‌লা মড়ার গায়ে ঘা,
রক্ত পড়ে—চেটে খা!

গ্রাহ্য না করে দু'জনে এগিয়ে চল্লো, কিন্তু ছেলের পালও

না-ছোড় !—সঙ্গে-সঙ্গে যেতে-যেতে, চারদিক ঘিরে কেবলই চেঁচাতে লাগ্‌লো—

পাগ্‌লা মড়ার গায়ে ঘা,
রক্ত পড়ে চেটে খা !

ক্রমে ব্যাপারটা এমন হলো যে, আর সইতে না পেরে, সান্ত্রী কর্‌লে তাড়া। ছেলের দলও পেয়ে গেলো মজা। সান্ত্রী যে দিকে তাড়া করে, সেই দিকের ছেলেরা ছুটে পালায়, আর অমনি অন্য দিকের ছেলেরা লোকটাকে ঘিরে চেঁচিয়ে ব'ল্‌তে থাকে—

পাগ্‌লা মড়ার গায়ে ঘা,
রক্ত পড়ে—চেটে খা !

আর ধূলো, কাদা, ঘাস, কাঁকর, যে যা পায়, ছুড়ে মারে চারদিক থেকে। তাদের উৎপাত আর অত্যাচারে শেষে সত্যি-সত্যিই মানুষটা হয়ে গেলো পাগলের মতো।

## পাঁচ

চারদিক থেকে রব উঠ্‌লো—'পাগল!' 'পাগল!' দেখ্‌তে-দেখ্‌তে চারদিকে লোকের এমন ভিড় জমে গেলো যে, তার ভেতর থেকে বেচারাকে বার করে নিয়ে যাওয়া এক্‌লা সান্ত্রীর পক্ষে হ'লো মহা মুস্কিল।

সুধু কি তাই? ভিড়ের ভেতর থেকে যার যা খুসি তাই বল্‌তে লাগলো। কেউ বল্লে—'বেটা চোট্টা, মার।' কেউ বল্লে—'ধরে কয়েদখানায় নিয়ে যাও।' কেউ বল্লে—'গাছে বেঁধে মাথায় জল ঢাল।' কেউ বল্লে—'বোধ্‌সমন্দরে নিয়ে গিয়ে চুবোন্ দাও।'

সেই সময়ে এক নাপিত যাচ্ছিলো সেই রাস্তায়। দেখেই তো জনকতক হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে উঠলো—"ওহে, এই পাগলটার মাথাটা নেড়া করে দাওতো?"

শুনে বেচারা গণক্‌কার চম্‌কে উঠলো, তাড়াতাড়ি মাথার পাগড়ীটাকে দু'হাতে চেপে ধরলে। তাই দেখে সকলেরই

ঝোঁক পড়্‌লো সেইটেকে আগে টেনে খোল্‌বার জন্যে। অমনি বিষম টানাটানি—ধস্তাধস্তি পড়ে গেলো।

অত লোকের সঙ্গে বেচারা আর পারবে কতক্ষণ? জন দুই ফর্‌-ফর্‌ করে টেনে খুলে ফেল্লে পাগড়ীর লম্বা কাপড়খানাকে। অমনি মোহর দুটো রাস্তায় পড়ে গেলো ঝন্‌-ঝন্‌ করে।

আর দেখে কে? অমনি তুমুল ব্যাপার বেধে গেলো। সবাই চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—'ব্যাটা ডাকাত—ডাকাত—বাঁধো।'

এবার সান্ত্রীও হয়ে গেলো সেই সব লোকেদের দিকে। "তবেরে ডাকু!" বলে, বিষম রেগে মারতে গেলো তাকে। গণক্‌কার বেচারা ভয়ে চোক বুজ্‌লে নিরুপায় হয়ে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ হয়ে গেলো যেন ভেল্‌কীর খেলা!

অত হট্টগোল একেবারে চুপ হয়ে থেমে গেলো। কেউ আর ভরসা করে গণককারের গায়ে আঙ্গুলটিও ছোঁয়াতে পারলে না, বরং সকলেই, ফাঁক হয়ে, অনেকখানি জায়গা ছেড়ে, সরে দাঁড়ালো। গণককার আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে দেখলে, তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল মূর্ত্তি, শান্ত গম্ভীর এক বেজায় বুড়ো বৌদ্ধ ভিক্ষু! তাঁর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন পুণ্যের ছটা ঠিক্‌রে বার হচ্ছে! "গুরু-মহারাজ জি কী জয়!" বলে সকলেই ভক্তি-ভরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো!

রাজ-গুরু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—"কি হয়েছে এখানে?"

জন দুই লোক সেই মোহর দুটো তাঁর হাতে দিয়ে আগাগোড়া সকল কথা বুঝিয়ে বল্লে। তিনি মোহর দুটোকে বেশ

করে নেড়ে-চেড়ে দেখে বল্লেন—"এ যে দেখ্‌ছি অনেক কালের পুরোণো—প্রায় দু'শো বছর আগেকার—রাজা শিলাদিত্যের নাম খোদা মোহর! এ মোহর তুমি কোথায় পেলে বাবা?"

সারাদিন ধরে নানা রকমের তাড়না খাবার পরে ভিক্ষুর মিষ্টি কথায় গণককারের মন গলে গেলো, দু'চোক দিয়ে জল ছুট্‌লো দর দর করে! ভক্তিভরে ভিক্ষুকে প্রণাম করে বল্লে—"সকল কথা আপনার কাছেই খুলে ব'ল্‌বো, কিন্তু আগে আমাকে রক্ষা করুণ এই অত্যাচারের হাত থেকে—ক্ষিদে-তেষ্টায় প্রাণ যায়।"

"আহা—এস, এস বাবা আমার সঙ্গে!" ব'লে রাজ-গুরু সান্ত্রীর দিকে চাইলেন। সে তখনি ধাক্কা দিয়ে ঠেলে, ভিড় সরিয়ে, পথ সাফ করে দিলে। রাজ-গুরু গণককারকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেম তাঁর আশ্রমে।

* * * *

সেই রাত্রেই রাজার একদল সান্ত্রী হিমালয়ের সেই গুহাতে গিয়ে, বাকী সতের জন সন্ন্যাসীকে পরম সমাদর করে নিয়ে এলো রাজ-গুরুর আশ্রমে। মাসদুয়েক পরে, রাজা হর্ষবর্দ্ধন, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে—এই আঠারো জন ভিক্ষু-সন্ন্যাসীর **আজব ঘুমের** ইতিহাস শুনে, যত্ন করে লিখিয়ে রাখলেন রাজ-বাড়ীর পাঠাগারে—কেতাবখানায়।

---

## এক

পৃথিবীতে অসম্ভব কোনও কিছু ঘট্‌তে শুনলে, লোকে যেমন হঠাৎ বিশ্বাস ক'রতে চায় না, তেমনি, বাঙ্গালীর মেয়েদের কোনও আশ্চর্য্য রকম দুঃসাহসের কথা শুনলে লোকে মনে করে গল্প! কিন্তু তেমনি এক ঘটনায় অরবিন্দের বুঝ্‌তে বাকী রইলো না যে, আগেকার দিন তাদের আর নেই, দুঃসাহসের কাজে এগোতে তারাও এখন আর ভয় পায় না মোটেই।

অরবিন্দ রায় বৈদ্যের ছেলে, তার বাপ ছিলেন বিলাত-ফেরত—ম্যাজিষ্ট্রেট। ছেলে-বেলা থেকে বাপের সঙ্গে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে, সাহেব-সুবোর সঙ্গে থেকে-থেকে, এক দিকে সে যেমন লেখা-পড়া শিখে পণ্ডিত হয়েছিলো খুব, অন্যদিকে তেমনি তার স্বভাবও হয়ে গিয়েছিলো—সাহেবদের মতো—সাহসী, বে-পরোয়া, প্রাণের ভয়-ভাবনা-শূন্য মরিয়া! তার ওপর, অজানা দেশের পাহাড়-পর্ব্বত বন-জঙ্গলের ভেতরে কোথায় কি আছে—

দেখ্‌বার, বড় বড় হিংস্র জানোয়ার শিকার করবার, আর অসভ্য জংলা মানুষদের বিবরণ জানবার ঝোঁক এমন বেড়েছিলো যে, নিজের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বড় বড় সাহেব-শিকারীদের সঙ্গে, কেবলই নানা রাজ্যের অজানা পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে বেড়োতো।

তাতে, এক দিকে—বড় শিকারী ব'লে—যেমন তার নাম রটেছিলো, অন্য দিকে তেমনি, জংলা কালো মানুষদের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প লেখবার জন্যে, তার নাম জান্‌তো না—এমন লোক ছিল না ব'ল্‌লেই হয়। অরবিন্দও, কোথাও কোন বড় জানোয়ারের নাম শুন্‌লে, কি কোন আশ্চর্য্য ব্যাপারের একটু গন্ধ পেলেই, অমনি বন্দুক ঘাড়ে ছুটে গিয়ে হাজির হতো সেইখানে। তেমনি করে, অসভ্য বুনোদের ভেতরে সভ্য মানুষদের এক ফর্‌সা ছেলের থাকবার কথা শুনে, সে গিয়ে ঢুকেছিলো—দাক্ষিণাত্যের পাহাড়-জঙ্গলে ভরা এক অজানা রাজ্যের ভেতরে।

দিন পাঁচ-ছয় বাঘ ভাল্লুক মার্‌তে মার্‌তে এগিয়ে যাবার পরে সে গিয়ে পড়্‌লো—চারদিকে গভীর বনে ঢাকা—ছোট একটা জলার কাছে—খানিকটা ফাঁকা জায়গাতে।

হঠাৎ মানুষের ভয়ের চীৎকারে অরবিন্দ চম্‌কে চেয়ে দেখ্‌লে, জলার একধারের বড় বড় ঘাস আর ঝোপ-ঝাড় তোলপাড় করে, ভূতের মতো একটা কালো লম্বা মানুষ, প্রাণের দায়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে তারই দিকে ছুটে আস্‌ছে বিকট চেঁচাতে-চেঁচাতে !

অরবিন্দ তার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারলে না। কিন্তু পরক্ষণেই কাণে গেলো এক বিষম ভোঁস্ ভোঁসানির শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গেই চোকে পড়্‌লো—বিরাট চেহারার এক সাংঘাতিক বুনো মোষ তেড়ে আস্‌ছে সেই মানুষটার পেছনে।

অরবিন্দ তোয়ের হতে না হতে মোষটা এসে পড়্‌লো প্রায় তার ওপরে, আর ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ শিকড়ে পা আট্‌কে, বোচারা হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলো আকাশ ফাটা চীৎকার করে। আর এক মিনিট—লোকটার সব শেষ হয়ে যায়!

অরবিন্দ যেন ক্ষেপে উঠলো, চোকের পলকে বন্দুক তুলেই ছাড়লে—গুড়ুম্—গুড়ুম্! মোষটা একবার শূন্যে লাফিয়ে উঠেই ধপ্ করে পড়লো সেইখানে, তারপর দু'চার বার পা নেড়ে স্থির হয়ে গেলো।

অরবিন্দ কাছে গিয়ে দেখলে, লোকটা মূর্চ্ছা গেছে। তার সেবা করে জ্ঞান ফেরাতে সন্ধ্যা হয়ে এলো, সঙ্গের চাকর দুজনকে হুকুম করলে, সেইখানেই তাঁবু ফেলবার জন্যে।

লোকটা কাঠুরে, পরের দিন সকালে অরবিন্দ তার কাছে শুন্‌লে যে, মাইল পনেরো দূরে, পাহাড়ের ভেতরে এক রকম কালো মানুষ আছে, তারা এক ভাল্লুকের বাচ্ছার সঙ্গে একটি ফর্সা মেয়েকে পেয়ে, নিজেদের কাছে এনে রেখেছে। সেই কথা শুনে, কাঠুরে চলে যাবার পরে, অরবিন্দ সেইখানে যাবার জন্যে তাঁবু তুল্‌তে হুকুম ক'র্‌লে। কিন্তু সে দিন তা ঘ'ট্‌লোনা।

"বন্দুক এনে অরবিন্দের হাতে দিলে"

সন্ধ্যার পরে অরবিন্দ তাঁবুর সামনে ব'সে ক্যাম্প-টেবিলে আলো রেখে, মোষের ব্যাপার লিখ্‌ছিলো, হঠাৎ তার চাকর ঝপ্‌সি হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটে এসে বল্লে—

"ঘোড়াপর কোই আতা হ্যায় হুজুর।"

"দূর—ঘোড়ায় চড়ে এখানে কে আসবে ?"

"কেয়া মালুম—ওই শুনিয়ে।"

অরবিন্দ কাণ পেতে শুন্‌লে, সত্যিই ঘোড়ার পায়ের অস্পষ্ট আওয়াজ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। ঝপ্‌সির দিকে চাইতেই, সে তাঁবুর ভেতর থেকে বন্দুক এনে অরবিন্দের হাতে দিলে।

কিন্তু অরবিন্দ বন্দুক না তুল্‌তেই হঠাৎ পাশের দিকের বনের ভেতর থেকে, মেয়েছেলের খিল্‌-খিল্‌ হাসি উঠ্‌লো, আর পরক্ষণেই এক ঘোড়সওয়ার মেয়ে, বন ঠেলে বেরোতে-বোরোতে তেমনি হেসে বলে উঠ্‌লো—

"থামুন, থামুন—আমি শত্তুর নই—মেয়েছেলে, তায় একলা।"

## দুই

হঠাৎ মাথার ওপর আকাশ ভেঙ্গে প'ড়্লে লোকে যত না আশ্চর্য্য হয়, তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হয়ে অরবিন্দ এক দৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইলো ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে, তারপর মেয়েটি কাছে আসতেই ঝপ্‌সিকে ইসারা ক'র্‌লে। সে ছুটে গিয়ে ঘোড়ার মুখ ধরে দাঁড়ালো।

অরবিন্দ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো তার হাত ধরে নামিয়ে নেবার জন্যে, কিন্তু তার আগেই সে—রেকাবে ভর দিয়ে—তড়াক্‌ করে লাফিয়ে নেমে, হাস্‌তে-হাস্‌তে জিজ্ঞাসা করলে—"মিষ্টার রায়, আশা করি?"

"হ্যাঁ" ব'লে, অরবিন্দ ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে —"আ—আ—আপনি?—"

"আমাকে 'আপনি' বলে লজ্জা দেবেন না, আমি মীরা—মীরা গুপ্তা—ডাক্তার অখিল সেনের ভাগ্‌নী।"

"এ্যাঁ—মীরা—মী—রা—?"

"হ্যাঁ, বাঘ নই—ভাল্লুক নই, ডাইনি নই—পেত্নী নই,

খোদ মীরা গুপ্তা, আপনার আগেরকার দিনের সেই আট-বছর বয়সের ছাত্রী।"

ব'লে, খিল্-খিল্ করে খুব একচোট হেসে নিয়ে, শেষে বল্লে—"হক্‌চকিয়ে গেলেন যে! জলপাইগুড়ির কথা মনে পড়ে না? আপনার বাপ ছিলেন সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট, আর আমার মামা ছিলেন ডাক্তার, বছর তেরোর কথা বই তো নয়?"

"কিন্তু তের বছর কি কম দিন—একটা যুগ চলে গেছে যে! তাতে তোমার চেহারার আশ্চর্য্য রকম বদলে, হঠাৎ যদি চিন্‌তে না পেরে থাকি তো আমার দোষ দিতে পার না।"

বলে, অরবিন্দ তাড়াতাড়ি চেয়ার খানা এগিয়ে দিয়ে একটা ক্যাম্প-টুল আনিয়ে, বসে, ঝপ্‌সিকে হুকুম করলে ঘোড়াটার তদ্বির করবার জন্যে। ব্যাপার বুঝে তার অন্য নেপালী চাকর 'হররাজ' আগে থাকতেই চা আর খাবারের ব্যবস্থা করেছিলো। একটু পরেই এনে হাজির করে দিয়ে বল্লে—"খানার ঘণ্টা দেড়েক দেরী হবে হুজুর!"

মীরা হেসে বলে উঠ্‌লো—"আর খানা না হলেও দুঃখু নেই, কেবল এই এক কাপ্ চায়ের জন্যে কাল বিকাল থেকে আমি আমার সমস্ত সম্বল খরচ করতে পারতুম!"

"তা কি হয়?" বলে, অরবিন্দ হুকুম করতে সে তাড়াতাড়ি চলে গেলো, তারপরে মীরার দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কাল বিকাল থেকে এই বনে—"

বাধা দিয়ে, তেমনি হাস্‌তে-হাস্‌তে মীরা বলে উঠ্‌লো—"কাল বিকাল বল্‌ছেন কি, আজ চারদিন থেকে—"

"এ্যাঁ—চারদিন! তোমার সঙ্গের লোকজন—"

"লোকের ভেতর আমি, আর জনের ভেতর আমার ঘোড়া, তা'ছাড়া আর কোথায় কাকে পাবো?"

এবার অরবিন্দ দু'-চোক ডাগর-ডাগর করে কপালে তুলে বেজায় আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠ্‌লো—"কি সর্ব্বনাশ! বল কি! তুমি একলা এই সাংঘাতিক বিপদ-ভরা বনের ভেতরে চারদিন ধরে—কেন—কিসের জন্যে—"

"শুধু আপনাকে খুঁজে বার করবার জন্যে। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে পারবো। ষ্টেশনে নেমে সহরে ঢুকে সাহেব পাড়াতে আপনার নাম করে খুঁজতে, শুন্‌লুম যে, দিন দশ-বারো আগে আপনি এই বনে শিকারে ঢুকেছেন। এক বুড়ো কর্ণেল তাঁর ঘোড়াটা দয়া করে আমায় দিয়ে, যে পথে শিকারীরা যায়—দেখিয়ে দিলেন। আমিও সেই পথে বনে ঢুকে, এক সাহেব শিকারীর দেখা পেয়ে গেলুম। তিনি আপনাকে জানেন, কিন্তু আপনি যে কোন দিকে গেছেন, তা বলতে পারলেন না। শেষে দু'পুরের পরে হঠাৎ এক কাঠুরের সঙ্গে দেখা হতে আপনার সন্ধান পেলুম। সাহেবও আমার সঙ্গে আসতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর ঘোড়ার জখমের জন্যে দিন দুই দেরী করতে বল্লেন। আমি তা পারলুম না। সেই থেকে এই বন্ধুর সঙ্গে একলা ঘোড়ার

পিঠে আসছি।” ব’লে, একটা রিভলভার বার করে দেখিয়ে দিলে। অরবিন্দ জিজ্ঞাসা ক’রলে—“কাল রাত্তির কাটালে কোথায় ?”

“একটা গাছের কোটরে।”

অরবিন্দ খানিকক্ষণ আশ্চর্য্য হয়ে মীরার মুখের পানে চেয়ে থেকে বল্লে—“আমাকে অবাক্ করেছো, বাঙ্গালীর মেয়ে যে এ রকম দুঃসাহসের কাজ কর্‌তে পারে, তা তোমাকে না দেখ্‌লে কিছুতেই বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু আমাকে কেন ?”

“সে অনেক কথা—দয়া করে মন দিয়ে শুনুন।”

## তিন

অরবিন্দ জান্‌তো যে মীরা বড় মানুষের মেয়ে, দেশে তাদের ঘর-বাড়ী জায়গা-জমি, বিষয়-সম্পত্তি যথেষ্ট ছিলো, ছিলনা কেবল দেখাশুনো করবার কোন আপনার জন—অভিভাবক। তাই তার মামা অখিল সেন, বোন আর ভাগ্‌নীকে নিজের কাছে রাখতেন। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে মীরা বল্লে—

"আমার জন্মের বছরেই বাবা মারা গেলেন। আর সেই বছরেই আমার একমাত্র কাকা এই অঞ্চলে ফরেষ্টারের চাকরি পেয়ে দেশ থেকে কাকী-মাকে আর তাঁদের বছর দেড়েকের ছেলেকে নিয়ে গেলেন। বাড়ীতে আমায় নিয়ে মা রইলেন একলা। ঠাকুরদাদার আমলের এক বুড়ো নায়েব ছিলেন, তিনিই বিষয়-সম্পত্তি আর আমাদের দেখাশুনো ক'রতেন। কিন্তু বরাতে সইলোনা—পর বছরেই তিনিও চোক বুজলেন—ব্যস্।"

"কেন, তোমার কাকা কি দেশে ফিরতেন না ?"

খিল্-খিল্ করে আর একবার হেসে, মীরা জবাব করলে—"থাক্‌লে তো ?"

তারপরেই তার মুখের হাসি শুকিয়ে গেলো, গম্ভীর ধরা-

ধরা গলায় বল্লে—"এই বারেই ঘটনা আরম্ভ। শুন্‌লে ভাববেন গল্প, কিন্তু তা নয়. মার মুখে শোনা—এক বর্ণ মিছে কি মন-গড়া নয়। আর তাই, বি, এ, পরীক্ষা না দিয়েই কলেজ ছাড়তে বাধ্য হয়ে, আজ আমি একলা—এতদূরে—এখানে আপনার সন্ধান করবার জন্যে এয়েছি।"

"আমার—আমার সন্ধান—এযে হেঁয়ালির মতো—"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে, মীরা খপ্ করে বলে উঠ্‌লো—"ওঃ—পাগল ভাবছেন বুঝি আমাকে? আমার এ অবস্থায় তা ভাবা আপনার পক্ষে অসঙ্গত নয়, কিন্তু সব শুনলে বুঝতে পারবেন যে, জগতে যদি কেউ আমাদের উপকার করতে পারে, তো সে একমাত্র আপনি। মারও সেই ধারণা ব'লে—"

এবার অরবিন্দও তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌লো—"থাক্—থাক্, তোমার ঘটনাটা বল।"

"নায়েব মশায়ের মরবার খবর পেয়ে কাকা মাকে লিখে-ছিলেন যে, তিনি ছুটীর দরখাস্ত করেছেন, মঞ্জুর হয়ে এলেই দেশে ফিরবেন—সেই তাঁর শেষ চিঠি। তখন বর্ষার মুখ, দিন দশেক পরেই কাগজে এক খবর রটলো, যে এই দেশের ফরেষ্টার গুপ্ত-সাহেব বনের ভেতরে একটা পাহাড়ে-নদী পার হতে গিয়ে স্ত্রী আর একমাত্র বছর দুয়ের ছেলের সঙ্গে ডুবে মরেছেন। দু'দিন পরে তাঁদের স্বামী আর স্ত্রীর লাস্ পাওয়া গেছে, কেবল ছেলেটির কোন খোঁজ-খবর মেলে নি।"

অরবিন্দের মুখ দিয়ে আর কোন কথা সর্‌লোনা, হতভম্বের মতো একদৃষ্টে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলো মীরার মুখের দিকে। সে বলে গেলো—"খবর পেয়ে মামা ছুটী নিয়ে আমাদের বাড়ীতে এলেন, তারপর তিনি এখানকার আফিসে খবর নিয়ে জানলেন যে ঘটনা সত্যি, কাকা আমার স-পরিবারে ডুবে মরেছেন। শেষে মামার ছুটী ফুরোতে, আমাদের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনো করবার জন্যে একজন নতুন ম্যানেজার বাহাল করে, মাকে আর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে রাখলেন। বছর কতক পরে তিনি যখন জলপাইগুড়িতে বদ্‌লি হয়ে গেলেন, তখন আপনারাও ছিলেন সেইখানে। সেই আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয়! সেই থেকে মা আর আমি বরাবর মামার কাছেই ছিলুম। কিন্তু আমার ম্যাট্রিক পাশ করবার পর, কলেজে পড়বার স্থবিধের জন্যে, মা আমাকে নিয়ে আবার মামার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে রইলেন দেশের বাড়ীতে। এ বছর আমার বি, এ, একজামিন দেবার কথা। কিন্তু মাস পাঁচেক আগে মামা মারা গেলেন, আর ওদিকে কাকার শালা, ভেতরে ভেতরে আমাদের সেই ম্যানেজারের সঙ্গে ষড়্‌ করে, হঠাৎ একদিন এসে আমাদের দু'জনকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব দখল করে বস্‌লো। মার হাতে যা কিছু ছিলো, প্রায় সমস্তই খরচ করে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলুম, কিন্তু ফল হ'লোনা। উকীলেরা ব'ললেন—ফরেষ্টার গুপ্ত

সাহেবের সেই ছেলেকে যদি পাওয়া যায় তো, ফল হতে পারে, নইলে নিরুপায়। কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকেও পড়াশুনো ছাড়তে হলো।”

অরবিন্দ একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বল্লে—“ওঃ, বড়ই দুঃখের কথা, কিন্তু সে ছেলেকে আর পাবে কোথায়? আর আমিই বা কি উপকার করিতে পারি তোমাদের?”

মীরা, জবাব না দিয়ে, নিজের জামার পকেট থেকে এক খানা খবরের কাগজের একটা পাতা বার করে, তার হাতে দিয়ে বল্লে—“পড়ুন।”

## চার

কাগজখানা পড়েই অরবিন্দ চম্‌কে উঠ্‌লো, তার মুখখানাও উৎসাহ আর উল্লাসে হয়ে উঠ্‌লো উজ্জ্বল।

কিন্তু পরক্ষণেই কি ভেবে তা আবার অন্ধকার হয়ে গেলো, সে ভাবতে-ভাবতে বল্লে—"দেখ, সংসারের মানুষ হঠাৎ বিশ্বাস না করলেও, এ রকম ঘটনা নতুন, কি আশ্চর্য্য, কি আজগুবী নয়। আমার জীবনেই পাহাড়-বনে অসভ্য জংলা মানুষদের ভেতরে আমি তিন-চার জন শাদা চেহারার সভ্যজাতের ছেলে দেখেছি, তাদের অতি শৈশব থেকে, বানরে, ভাল্লুকে, এমন কি বাঘেও নিজের বাচ্ছার সঙ্গে মানুষ করেছে। বিশেষ করে, বানরে মানুষ করেছে, এমন গল্প তো অনেক শোনা যায়। কিন্তু তাদের প্রায় সকলেই শাদা নাবিকদের ছেলে-মেয়ে। এমন একটি ছেলেকেও জানি যে, তার বাপ গোরা আর মা অন্য জাত। তাদের চেহারা ফরসা, আর দেখতে সভ্য মানুষদের মতো হলেও, তারা অসভ্য জংলীদের মতোই হয়ে গেছে। কিন্তু কোন বাঙ্গালী ভদ্দর লোকের ছেলের কথা আজ পর্য্যন্ত শুনিনি।"

মীরা কিন্তু অরবিন্দের কথা শুনে উৎসাহে বলে উঠ্লো—"শোনেন নি বলে যে হ'তে পারেনা, তার কারণ কি? যিনি লিখ্ছেন তাঁর কথা কি মিথ্যা মনে করেন?"

"না, না—মিথ্যা নয়—ইনি একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী, খাঁটী খবর না জেনে লেখেন নি। আমিও সহরে এই রকম একটা গুজব শুনে এয়েছি। জলে-ডুবির পরে তোমার কাকা আর কাকীমার লাস্ পাওয়া গিয়েছিলো ব'ল্ছো. কিন্তু তাঁদের দু'-বছরের ছেলেটীর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। তোমার সেই ভাইকে বানরে কি অন্য কোন জানোয়ারে পেয়ে, নিয়ে গিয়ে মানুষ করেছে, এ কথা মিছে কিম্বা অসম্ভব নয়। কিন্তু তা অনেক কালের কথা, এখন সে নিশ্চয়ই খুব বড় হয়েছে, এখন তাকে দেখ্তে পেলেও, সে যে তোমার সেই ভাই তা বুঝবে কিসে?"

"তার বয়স আমার চেয়ে বছরখানেক বেশী—আন্দাজ চব্বিশ।"

"তাতে হবে না, শরীরের কোথাও কোন বিশেষ চিহ্ন আছে?"

"আছে—তার জন্ম থেকেই বাঁ দিকের ভুরুর ওপরেই কুলের মতো একটা আব্ ছিলো—সেটা এতদিনে বড় হয়ে থাকবে।"

"হ্যাঁ, এটা ভালো প্রমাণ বটে, কিন্তু মানুষটিকে পেলেও দেখবে, সে জংলা—বেজায় অসভ্য। তাকে এখন এদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া যেমন কঠিন, তাকে অন্ততঃ কতকটা সভ্য করে তুলে, আদালতে প্রমাণ করা তার চেয়ে সহজ হবেনা।"

ব'লে, অরবিন্দ হতাশ ভাবে একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়লে। মীরা কিন্তু ভরসা দিয়ে উৎসাহে ব'লে উঠ্‌লো—"সে সমস্ত ভার নেছেন আমাদের এ্যাটর্ণী, আমাদের স্থধু এই মানুষটার সত্যিকারের খাঁটী খবর নিয়ে গিয়ে দেওয়ার সম্পর্ক—ব্যস্! তারপরে মোকদ্দমায় জিত্‌লে বিষয়ের অর্দ্ধেক দিতে হবে তাঁকে।"

"যদি ঠিক মানুষটিকে পাওয়া যায়, তবে না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু না পাওয়া গেলেও আমাদের আর বেশী ক্ষতি কি? আমরা তো সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পথে বসেইছি, অভাবে প'ড়ে আমার পড়াশুনো পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছে। এখন যদি কোনো রকমে এই খবরটা সন্ধান করে নিয়ে গিয়ে দিতে পারি, তো—সেই একমাত্র ভরসা! আর তা কেবল পারেন একমাত্র আপনি, নইলে মা বলেন—জগতে এমন বন্ধু আমাদের আর কেঁউ নেই—"

বাধা দিয়ে, অরবিন্দ জিজ্ঞাসা ক'রলে—"তিনি এখন কোথায়?"

"নাগাপত্তনে মামার এক বন্ধুর বাড়ীতে তাঁকে রেখে, তাঁর কথা মতো আপনার সন্ধানে বেরিয়েছি।"

'তুমি অনেক ঘুরে এয়েছ, এখান থেকে নাগাপত্তনের সোজা পথ আছে পশ্চিমের ওই পাহাড়-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, মাঝে-মাঝে কাঠুরেরাও যাওয়া-আসা করে। তুমি ফিরে গিয়ে তাঁকে বল যে, এ ভার আমি নিলুম, যত শীগ্‌গির পারি, খবর নিয়ে গিয়ে হাজির হবো।"

মীরা সঙ্গে থাক্‌তে চাইলেও অরবিন্দ কিছুতে রাজী হলোনা, তখন সে ফিরে যাবার জন্যে উঠ্‌লো, কিন্তু অরবিন্দ বাধা দিয়ে বল্লে—"তা হবে না, বেজায় পরিশ্রম করে এখানে এয়েছো, আজ রাত্তিরে আমার তাঁবুতে ঘুমিয়ে জিরিয়ে নাও, কাল সকালে আমি সঙ্গে গিয়ে নিরাপদ জায়গা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আস্‌বো। আজ রাত্তিরটা ঘুমিয়ে জিরিয়ে নাও।"

"আর, আপনি ?"

"আমি আজ শোব না, এখানে এক রকম শাদা হরিণ দেখেছি, চাঁদ উঠ্‌লেই জলার-ধারে গিয়ে বস্‌বো তাদের একটাকে বাগাবার চেষ্টাতে।"

মীরা কেবল মনে-মনে একটু হাস্‌লে। তারপর খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে, অরবিন্দ বন্দুক নিয়ে বনের ভেতরে চলে গেলো, আর মীরা তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়্‌লো তার ক্যাম্প-খাটে।

## পাঁচ

ঘণ্টা চারেক একভাবে গভীর ঘুমের পর, মীরা যখন হঠাৎ জেগে উঠ্‌লো, তখন তার সমস্ত শ্রান্তি দূর হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গিয়ে দেখ্‌লে—কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠীর চাঁদ এয়েছে মাথার ওপরে। রাত আন্দাজ দুটো ঠিক করে, সে আর মোটেই দেরী করতে ভরসা ক'রলে না, তাড়াতাড়ি ঘোড়াটাকে ঠিক করে নিয়ে, চড়ে বসেই, হাঁকিয়ে দিলে—অরবিন্দের দেখানো নাগাপত্তনের পথে।

ওদিকে চাঁদ ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে আকাশে একটু একটু করে মেঘ উঠে যে চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌তে স্বরু করেছিলো, সে দিকে মীরার নজর ছিলনা মোটেই, সে এগিয়ে যেতে-যেতে কেবলই ভাবতে লাগলো—পাছে অরবিন্দ এসে তাকে ধরে। ভাবতে-ভাবতে মীরা বনের আলো-ছায়ার ভেতর দিয়ে ঘোড়াটাকে অন্যমনস্ক ভাবে চালাতে লাগলো সাধ্য মতো জোরে।

কিন্তু সে যে কতক্ষণ সেই ভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সেদিকে তার খেয়ালই রইলো না। হঠাৎ এক জায়গায় ঘোড়াটা থ'ম্‌কে

দাঁড়াতে, সে চম্‌কে উঠে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে দেখলে যে, চারদিকেই এমন গাছ-পালা আর ঝোপ-ঝাপের আটক যে, তার ভেতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যাওয়া মুস্কিল। বাধ্য হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে, চাবুক, রিভলভার, ঘোড়ার পিঠের জিনে গুঁজে রেখে তার মুখের রাশ ধরে সাবধানে বার করে নিয়ে যেতে লাগলো অতি কষ্টে ঝোপ-ঝাপের ফাঁক দিয়ে।

তারপরে সে অনেকটা ফাঁকা জায়গাতে বেরুলো বটে, কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌লে যে, সারা আকাশ এমন ভয়ানক কালো মেঘে ছেয়ে গেছে যে, সকাল হলেও তা বোঝবার যো নেই। সে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উপায় ভাব্‌তে লাগ্‌লো।

ঘন-ঘন বিদ্যুতের চক্‌মকানিতে চোখ ঠিক্‌রে দিচ্ছিলো, সঙ্গে সঙ্গে বাতাসেরও জোর বেড়েছিলো খুব। হঠাৎ সারা বন আলো করে—আকাশের এক দিক থেকে আর এক দিক পর্য্যন্ত—একটা লম্বা বিদ্যুত চম্‌কে গেলো, আর মিনিট খানেক না কাট্‌তেই এমন সাংঘাতিক আওয়াজ করে একটা বাজ পড়লো কাছে, যে মীরা থর্‌-থর্ করে কেঁপে চোক না বুজিয়ে থাকতে পারলে না। সেই শব্দে বেজায় ভয় পেয়ে, ঘোড়াটাও হঠাৎ এমন ভাবে লাফিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালালো যে, সে চোক চেয়ে আর তার চিহ্নও দেখতে পেলেনা। তারপরেই সুরু হলো মুষলধারে ঝমাঝম্ বৃষ্টি।

মীরা একটা ঝাঁক্‌ড়া গাছের গোড়াতে গিয়ে দাঁড়ালো বটে,

কিন্তু বৃষ্টির ধারা আর বাতাসের ঝাপ্‌টা এড়াতে পারলেনা। তার পোষাক ভিজে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত জল গড়াতে লাগলো দর্‌-দর্‌ করে। ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপুনী ধ'রে, দাঁতগুলোতে ঠক্ ঠক্ করে আওয়াজ হতে লাগলো। ঘোড়ার সঙ্গে-সঙ্গে, তার শুক্‌নো জামা, টুপি, পথের সামান্য খাবার, রিভলভার, পয়সা কড়ি—যা কিছু সম্বল ছিলো—সমস্ত হারিয়ে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে, প্রায় অজ্ঞানের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

কতক্ষণ যে সেই ভাবে কাটলো, তার হুঁস রইলোনা, হঠাৎ— জোরে-জোরে ঝোপ নড়ার শব্দে চম্‌কে. চেয়ে দেখলে, তার সাম্‌নে, মাত্র পাঁচ-ছয় হাত তফাতে, দাঁড়িয়ে বিকট চেহারার এক অসভ্য জংলা মানুষ! গায়ের রং চক্‌চকে তামার মতো, পরণে —কোমর থেকে হাঁটু অবধি—বাঘের চামড়ার মতো কোন কিছু, চুল বেজায় ঘন উস্কো-খুস্কো—সজারুর কাঁটার মতো, চোখ দুটো রাঙা—গোল—বড় বড়, কপাল ছোট ; চেহারা যেমন জোরালো —তেমনি ষণ্ডা, মুখের চেহারা তেমনি নিষ্ঠুর—ভয়ানক! পিঠে বাঁধা ধনুক আর তূণ, হাতে টাঙ্গী আর একটা তীক্ষ্ণ বল্লম, কোমরে একখানা ধারালো মস্ত ছোরা!

## ছয়

সেই অবস্থায় সেই মূর্ত্তি সামনে দেখে মীরার প্রাণ উড়ে গেলো, চকিতে কোমরে হাত দিয়ে রিভল্‌ভার নিতে গিয়ে, মনে পড়্‌লো, তার একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় ঘোড়ার সঙ্গে উধাও হয়ে গেছে! ভয়ের একটা অস্ফুট শব্দ মুখ দিয়ে বেরোতে যাচ্ছিলো, কষ্টে তা চেপে রেখে, বাইরে ভরসা দেখিয়ে, গম্ভীর আওয়াজে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"তোম্ কোন্—কেয়া মাংতা ?"

কিন্তু ধমক্‌টা ফুট্‌লো না, বরং গলাটা একটু কেঁপে গেলো। লোকটা কিন্তু জবাব করলে না, কেবল গম্ভীর ভাবে মাথা নুইয়ে সেলাম করলে, তারপরে হাতের বল্লম তুলে, সঙ্গে আসবার জন্যে ইসারা করে, নিঃশব্দে এগিয়ে চল্লো—ঝোপ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে —পথ দেখিয়ে আগে-আগে। দায়ে পড়ে, নেহাৎ নাচার হয়েই মীরাকেও যেতে হলো তার পেছনে-পেছনে।

ঝড়-বৃষ্টি থেমে গিয়েছিলো, কিন্তু মেঘের ভার একেবারে কাটেনি। গাছপালার ওপর থেকে যেমন জলের ফোঁটা ঝরে পড়্‌ছিলো টপ্‌-টপ্‌ করে, নীচেও তেমনি চারদিকেই জলের মৃদু স্রোত চলেছিলো এঁকে-বেঁকে। প্রায় মিনিট দশেক পর্য্যন্ত তার

ভেতর দিয়ে ঘুরে-ফিরে, লোকটা, মীরাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো একটা মাঝারি গোছের পাহাড়ের গোড়াতে। তারপরে এক জায়গার কতকগুলো ডালপালা আর গোটাকতক বড় বড় পাথর সরিয়ে, সে, আবার মীরাকে ঢোক্‌বার ইসারা করে, ঢুক্‌লো তার ভেতরে। মীরাও সাহসে ভর করে ঢুকে দেখ্‌লে—সেটা একটা সুন্দর গহ্বর— বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তার একধারে একটা আগুনের কুণ্ডে অল্প-অল্প আগুন রয়েছে, তার কাছেই আছে এক বোঝা শুক্‌নো ডাল-পালা কাঁড়ি করা, আর অল্প দূরে কোণের দিকে খান দুই কম্বল জড়ো করা পড়ে রয়েছে।

লোকটা সেই কুণ্ডে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে, মীরাকে ইসারা করে থাক্‌তে ব'লে, নিজে বাইরে বেরিয়ে গেলো। ঠাণ্ডাতে মীরার সর্ব্বাঙ্গ প্রায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, আগুন পেয়ে যেন বেঁচে গেলো, গা-মাথা, পোষাক-জুতো শুকিয়ে নিয়ে, কোণের জড়ো করা কম্বলগুলোর ওপরে জিরোতে বসে, দারুণ কষ্ট আর পরিশ্রমে কখন যে ঘুমিয়ে পড়্‌লো তা জানতেই পারলে না।

হঠাৎ বাইরের দিক থেকে একটা ডাকে তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো, কাণ পেতে শুন্‌লে, কে চেঁচিয়ে ডাক্‌ছে—"মেম্ সাব্ ?"

এতক্ষণে, মীরার মনে যে টুকু ভয় বা সন্দেহ ছিলো, সেই ডাক শুনে তা ঘুচে গেলো, ভাবলে—মেম ভেবেই জংলী মানুষটা কোন রকম অত্যাচার করতে ভরসা করেনি, বরং সেবা করছে যথেষ্ট। তাড়াতাড়ি গুহার মুখে গিয়ে বল্লে—"ঠিক হ্যায়।"

লোকটা গুহার মুখে ডালপালা ঢাকা দিয়ে চলে গিয়েছিলো, মীরার জবাব পেয়ে তাড়াতাড়ি সেগুলো আবার সরিয়ে ফেলে, ভেতরে ঢুক্‌লো টিনের কেটলিতে চা, একটা টিনের বাটী আর টিনের থালাতে কতকগুলো রাঁধা মাংস নিয়ে। মীরা বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লে—সামনেই অল্পদূরে একটা ঝাঁক্‌ড়া গাছের তলাতে তখনো অল্প-অল্প আগুন জ্বলছে, আর তার কাছেই ছড়ানো রয়েছে রাঁধবার সামান্য জিনিসপত্তর।

ভেতরে খাবার আর চা রেখে দিয়ে লোকটা তখুনি আবার বেরিয়ে এলো। দারুণ ক্ষিদেতে মীরার সর্ব্বাঙ্গ তখন ঝিম্ ঝিম্ ক'রছিলো, খেয়ে যেন নতুন জীবন পেলে। তারপরে গুহার ভেতর থেকে সে যখন বেরিয়ে এলো, তখন লোকটা আবার ভেতরে ঢুকে, সেই সব গুছিয়ে রেখে এসে সেলাম করে দাঁড়ালো।

দুপর পার হয়ে গেছে দেখে মীরা বল্লে—"নাগাপত্তন কা সিধা পথ দেখ্‌লাও।"

লোকটা একবার হাতের বল্লম তুলে—আশে পাশে ঘুরিয়ে দূরের পাহাড় গুলোর দিকে কি দেখিয়ে দিলে, তারপরে নিঃশব্দে পথ দেখিয়ে চল্‌লো আগে আগে।

## সাত

বনের ভেতর দিয়ে—আঁকা-বাঁকা পথে—প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরে-ফিরে চল্‌বার পরে, তারা গিয়ে পড়্‌লো—বেজায় ঘন ঝোপ-জঙ্গল আর বড় বড় ঝাঁক্‌ড়া গাছে ঢাকা পাহাড়-রাজ্যের ভেতরে। মীরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌লে যে, চারদিকের গাছপালা এমন ঘন, ঝাঁক্‌ড়া আর ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় জমাট যে, স্পষ্ট করে আকাশ দেখ্‌বার যো নেই। তার ওপর পথটার ছু'ধারেই—বড় বড় গাছের গোড়াতে আবার মানুষ ভোর উঁচু ঘন ঝোপ হয়ে, বেড়ার মতো যেমন ঘিরে রেখেছে, তেমনি আবার অগুণ্‌তি বুনো লতা তাদের জড়িয়ে উঠে, ঝোপের মাথাগুলোর ওপরটা ছেয়ে ফেলেছে চালের মতো করে। সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে ফূর্‌তিতে মীরার মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে গেলো—"বাঃ, বাঃ,—কি সুন্দর প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া গলি-পথ, না—না—পাহাড়ের টানেলের'—সুড়ঙ্গের—মতো বনের সুড়ঙ্গ।

কিন্তু ফূর্তি তার বেশীক্ষণ রইলো না। সেই পথে ঢোকবার সময় থেকেই মাথার ওপর থেকে নানা রকমের আশ্চর্য্য কিচির-মিচির্ শব্দ কেবলই কাণে আস্‌ছিলো, তার ওপর বড় বড় ঝাঁক্ড়া গাছগুলোর ওপরে মাঝে-মাঝে এমন প্রলয়ের মাতামাতি হচ্ছিলো যে, একবার চম্‌কে উঠে মীরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"ও কেয়া?"

লোকটা, মাথার ওপরের লতা-পাতার ফাঁক দিয়ে, কেবলই দেখবার চেষ্টা ক'র্‌ছিলো, গম্ভীর গলায় জবাব করলে—"বেল্‌কুল্ দুষমন্ হারামি লাল বন্দর!"

"লাল বাঁদর আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু এর ভেতর থেকে দেখ্‌বারও উপায় নেই।" ব'লে, মীরা ওপর দিকে চেয়ে ডাল-পালার ফাঁক দিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে এগিয়ে যেতে লাগ্‌লো। কিন্তু খানিকটা গিয়েই হঠাৎ থর্ থর্ করে কেঁপে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালো, তার মুখ দিয়ে বেজায় ভয়ে বেরিয়ে গেলো—"ওঃ বাবারে—কী—ও?"

লোকটা চার-পাঁচ হাত এগিয়ে গিয়েছিলো, চম্‌কে ছুটে মীরার কাছে এসে ওপর দিকে চেয়ে দেখ্‌লে—পাতার ফাঁকে সাংঘাতিক রকমের অস্বাভাবিক মানুষের মতো একটা মুখ তাদের দিকে চেয়ে রয়েছে—চোক্-দুটো দিয়ে শয়তানের উল্লাস যেন ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে!

সঙ্গের জংলী লোকটা তাড়াতাড়ি ধনুকে তীর জুড়ে মারতে

গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌লে—মুখখানা আর সেখানে নেই। বলে উঠ্‌লো—"কেয়া তাজ্জব!"

মীরা জিজ্ঞাসা করলে—"কেয়া—শয়তান?"

"হো সক্‌তা—ডর্ নেই!" বলে, লোকটা মীরাকে এগিয়ে যেতে ইসারা করে, নিজে চল্‌লো পাশের ঝোপ-ঝাপের ভেতর দিয়ে—লতা পাতা ছিঁড়ে—ঠেলে—ফাঁক করে ওপরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই দিকে এগিয়ে। খানিকটা যাবার পরে মীরা তাকে আর দেখতে পেলে না, কেবল একবার কথা শুন্‌তে পেলে—"আদমি-বন্দর!"

"আদমি-বন্দর" শুনেই মীরার হঠাৎ ভাইয়ের কথা মনে হ'লো, চেঁচিয়ে হুকুম ক'র্‌লে—"মারো মৎ পাক্‌ড়ানেকো ফিকির কর।"

কিন্তু পাকড়াবে কি, হলো এক সাংঘাতিক ব্যাপার! সামনেই একটা ঝাঁক্‌ড়া গাছের মোটা ডাল ঝুলে পড়েছিলো ঝোপগুলোর ওপরে। সেইখানে যেতেই, হঠাৎ অতি বিকট একখানা মুখ চেকের পলকে—বাদুড়ের মতো ঝুলে পড়্‌লো মীরার মুখের কাছে আর সঙ্গে সঙ্গে দু'খানা বেজায় জোয়ালো হাত মীরার দুই বগলের কাছে ধরে পুতুলের মতো ঝুলিয়ে তুলে নিলে, ঝোপের মাথার ডালপালা ছিঁড়ে একেবারে ঝাঁক্‌ড়া গাছটার ওপরে!

## আট

মীরা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে, প্রাণপণে চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌লো নিজেকে ছাড়াবার জন্যে, কিন্তু সেই অসুরের মতো মানুষ-বাঁদরের জোরে তো পারলেই না, বরং তার বড় বড় ধারালো নখে মীরার পোষাকের সঙ্গে গা-হাত অনেক জায়গাতেই ছিঁড়ে গেলো। সে মীরাকে দু'হাতে পুতুলের মতো চোখের সামনে তুলে ধরে, দেখ্‌তে-দেখ্‌তে, এমন বিকট হাস্‌তে লাগ্‌লো, যে, ভয়ে মীরার প্রাণ উড়ে গেলো, তাড়াতাড়ি চোক বুজিয়ে দু' হাতে এলোপাথাড়ি ঘুষো চালাতে লাগ্‌লো তার মুখের দিকে, কিন্তু ফল হলো না।

সেই সময়ে, মানুষ-বাঁদরটার পেছন থেকে চুপিসাড়ে ডাল বেয়ে এসে, হঠাৎ কে একজন জোরে চেপে পড়্‌লো তার ঘাড়ের ওপরে। মানুষ-বাঁদরটা আচম্‌কা বিকট চেঁচিয়েই, পেছন ফিরে দেখ্‌তে গিয়ে—পারলে না। দায়ে পড়ে, মীরাকে এক হাতে ধরে রেখে, অন্য হাতখানা খুলে নিয়ে ঘুরিয়ে মারতে গেলো তাকে। মীরাও চম্‌কে চোক মেলে দেখ্‌লে যে, তারই সঙ্গী জংলা মানুষটা এসে মানুষ-বাঁদরটাকে মারবার চেষ্টা ক'রছে!

মীরার ভরসা বেড়ে গেলো অনেকখানি, সেও সঙ্গে-সঙ্গে আবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌লো, প্রাণপণে ঘুষো চালিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে। তিনজনের বিষম হুটোপাটি চ'ল্‌লো মোটা ডালটার ওপরে। কিন্তু কারুরই নজরে প'ড়্‌লো না যে, মানুষ-বাঁদরের বিকট চীৎকার শুনে, সাংঘাতিক চেহারার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এক দল লাল বাঁদর, রাগে গর্জ্জন ক'র্‌তে ক'র্‌তে, সেই দিকে ছুটে আস্‌ছিলো—বড় বড় ঝাঁক্‌ড়া গাছগুলোকে তচ্‌নচ্‌ ক'র্‌তে-ক'র্‌তে।

হঠাৎ সেই আওয়াজে তিন জনে চম্‌কে চাইলে সেই দিকে, আর অন্যমনস্কে মানুষ-বাঁদরের হাতখানা একটু আল্‌গা হ্‌তেই মীরাও ধপ্‌ করে খ'সে পড়ে গেলো মাটীতে। মানুষ-বাঁদরটাও সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে প'ড়্‌তে যাচ্ছিলো, কিন্তু জংলা মানুষের জোর ঘুষো খেয়ে ফির্‌লো সেই দিকে।

আবার গাছের ওপরে দু'জনের মারামারি—হুটোপাটি চল্লো, ওদিকে লাল বাঁদরের দলও এসে পড়্‌তে লাগ্‌লো কাছে। কিন্তু পরক্ষণেই দু'জনে জড়াজড়ি করে নীচে প'ড়ে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে, জংলা মানুষটার মাথা ভেঙ্গে খুলিটা যেন খ'সে গিয়ে ঠিক্‌রে পড়লো তফাতে। মীরা শিউরে উঠে চোক বুজলে।

কিন্তু তারপরে সে যখন আবার চাইলে, তখন তার বিশ্বাস হলোনা নিজের চোককে। মনে হলো—হয় স্বপ্ন, নয়তো দেখছে কোন ভোজবাজীর কাণ্ড! সে স্পষ্ট দেখলে যে, মানুষ-

বাঁদরটাকে চিৎ করে শুইয়ে ফেলে, দু' হাতে তার গলা চেপে ধরে জংলা মানুষটা বসেছে তার বুকের ওপরে, কিন্তু মানুষটার মাথার যেখান থেকে অতবড় চুলসুদ্ধ খুলিটা খসে গিয়ে তফাতে ঠিক্‌রে পড়েছিলো, সেখানে আবার সেই খুলি গিয়ে জোড়া লেগে তাতে দিব্যি আঁচড়ানো—তেড়ি কাটা—সুন্দর কোঁকড়ানো চুল বেরিয়েছে যেন কোন মন্তরের জোরে ! আবার সুধু তাই নয়, চুলের নীচে—মুখের কালো রঙের ওপরে—সুন্দর গৌরবর্ণ কপালের অনেকখানি, কালো মেঘে বিদ্যুতের মতো চক্ চক্ করছে ! মীরার মুখে আর কথা ফুট্‌লো না, হতভম্ব হয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো সেই দিকে।

তার দিকে চেয়ে, জংলা মানুষটা, হাসি চেপে বল্লে—"ইধার আইয়ে মেম্ সাব, কুচ ডর্ নেহি, ভালা কর্‌কে দেখিযে তো—"

লোকটার কথা শেষ হলো না, মীরা এবার চ'ম্‌কে লাফিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"এঁ্যা—এঁ্যা—কি ব্যাপার ! কী আশ্চর্য্য— আ—প—নি—?"

"তবু ভাল যে, এতক্ষণের পরে চিন্‌তে পারলে ! ভাগ্যে— ধস্তাধস্তিতে মাথার পরচুলটা খসে পড়েছিলো, নইলে সত্যিকারের অসভ্য জংলা মানুষের হাতে প'ড়লে কি ক'রতে বল দেখি ? না ব'লে রাত্তিরে একলা পালিয়ে এসে কী সাংঘাতিক দুঃসাহসের কাজ—"

আবার তার কথায় বাধা দিয়ে মীরা ব'লে উঠ্‌লো—"আর লজ্জা দেবেন না, যথেষ্ট শিক্ষা—"

এবার হো-হো করে হেসে, অরবিন্দ তার কথায় বাধা দিয়ে বল্লে—"থাক্, আর ও কথা নয়, মনে রেখো—এখন আমি সেই জংলা মানুষ—তোমার আরদালি। এবার এর দিকে দেখ দেখি— তোমার খুড়োর ছেলে কি না? এরও বাঁ দিকের ভুরুর ওপরে একটা বড় আব রয়েছে। ভয় নেই, আমি যুযুৎসুর প্যাঁচে ওকে কাবু করে রেখেছি—কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।"

মীরা কাছে গিয়ে বেশ করে দেখে আহ্লাদে বলে উঠ্‌লো—"ধন্য ঈশ্বর! এ সেই বটে, ওই আব ছাড়াও এই দেখুন আর একটা চিহ্ন। এক বছর বয়সে একবার সাংঘাতিক পড়ে গিয়ে ডান কাণের নীচের মাংসটা দু'ভাগ হয়ে কেটে গিয়েছিলো, ওই দেখুন—এরও ডান কাণের নীচের মাংসটুকু দু'-ভাগ করা।"

ঠিক সেই সময়ে লাল বাঁদরের দল হল্লা করে এসে পড়্‌লো ওপরের ঝোপ-ঝাপ আর গাছের মাথাতে। মীরা কেঁপে উঠ্‌লো; অরবিন্দ মানুষ-বাঁদরটাকে ছেড়ে লাফিয়ে সরে গিয়েই, তাড়াতাড়ি পরচুলটা তুলে নিয়ে আবার মাথায় দিলে, তারপরে কাপড়ের নীচে থেকে লুকানো রিভলভার বার করে দাঁড়ালো মীরাকে আড়াল করে।

মানুষ-বাঁদরটা ততক্ষণ তেমনি চুপ করে শুয়ে রইলো, তারপরে গোটা দুই লালবাঁদর সেই মোটা ডালটাতে এসে,

নীচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে যেমন গর্জ্জন করতে লাগ্‌লো, অমনি সে-ও, প্রথমটা আস্তে-আস্তে উঠে ব'সে, তারপরে তড়াক্ করে এক লাফে উঠে গেলো আবার সেই গাছটার ওপরে।

কিন্তু, তবুও বাঁদরের দল ঠাণ্ডা হলো না, বরং হল্লা তাদের আরো বাড়্‌তেই লাগ্‌লো। শেষে, নিরুপায় হয়ে, অরবিন্দ যখন বারকতক রিভলভার ছুড়্‌লে ওপরের দিকে, তখন তারাও তেমনি হল্লা ক'র্‌তে-ক'র্‌তে চলে গেলো দূরে। অরবিন্দ মীরাকে সঙ্গে করে দশ পনেরো মিনিট ধরে ঝোপের ভেতর দিয়ে গিয়ে শেষে বার হলো অনেকটা ফাঁকা জায়গাতে।

# নয়

সন্ধ্যা হবার বেশী দেরী ছিল না দেখে, দু'জনে তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগ্‌লো। খানিক পরে একটা উঁচু জায়গা—টিলা—পার হতে গিয়ে মীরা আশ্চর্য্য হয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"দেখুন, দেখুন, বনের গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে শাদা মতো দেখা যাচ্ছে কী ও ?"

অরবিন্দ হেসে বল্লে—"তুমি ভেবেছিলে, যে আমার কাছ থেকে পালিয়ে নাগাপত্তনের পথে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছ, কিন্তু তা নয়, অজানা বনে পথ ভুলে আমার কাছ থেকে তিন-চার মাইলের ভেতরেই ঘুরেছ, তার প্রমাণ দেখ, ওটা আমারই তাঁবু। এই সব উঁচু-নীচু পাহাড়-বনের ভেতর দিয়ে পথ ঠিক করে চলা বড় কঠিন।"

মীরা নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলে—"কিন্তু সে বানরের দলটা গেলো কোথায়, কোন দিকে তো তাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পেলুম না ?"

"মনে হয় এই অঞ্চলেই তাদের আড্ডা, কিন্তু তাঁবুর কাছে আস্‌তে ভরসা ক'রবে না।"

ব'লে অরবিন্দ মীরার দিকে চেয়ে হাস্‌লে। কিন্তু তার সে বিশ্বাস উল্‌টে যেতে দেরী হলো না। রাত্রে মীরাকে তাঁবুর

ভেতরে শুতে দিয়ে, নিজে গিয়ে রইলো পাশের দিকে, অল্প তফাতে, চাকরদের—পরদার-ছপ্পরের—সাম্‌নে একটা গাছের তলাতে।

কাছেই আগুনের কুণ্ডটা জ্বালিয়ে দিয়ে অরবিন্দ বন্দুক হাতে বসে পাহারা দিতে লাগলো; রাতও বেড়ে চল্লো চারদিকে অন্ধকার ঢেলে দিয়ে। গভীর রাত্রে ক্ষীণ চাঁদ উঠে জায়গাটা যখন একটু ফরসা হয়ে এলো, তখন—ঘুম ছাড়াবার জন্যে—সে একবার উঠে, তাঁবুর চারদিকে ঘুরে-ফিরে এসে, আবার বস্‌লো সেইখানে গাছের গায়ে ঠেসান্ দিয়ে। তারপরে কখন যে ঘুম এসে একটু একটু করে তার চোক দুটিকে বুজিয়ে দিলে তা সে জানতেই পারলে না।

হঠাৎ মীরার চীৎকারে অরবিন্দের ঘুম ভেঙ্গে গেলো, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁবুর পেছন দিক থেকে চাকর দু'জনেরও হৈ-হৈ চীৎকার উঠ্‌লো। সে ধড়্‌মড়িয়ে জেগে উঠে, উঠি-পড়ি ক'রে বন্দুক হাতে ছুট্‌লো সেই দিকে।

ভোরের আলোতে তাকে দেখেই চার-পাঁচটা বড়-বড় লাল বাঁদর লাফিয়ে ছুটে পালালো দূরে—দূরে। তার মনে হলো—মীরার সেই বাঁদর-ভাইও রয়েছে সেই সঙ্গে। সে হতভম্ব হয়ে দেখলে, তাঁবুর পেছনকার দোরের পরদা—কানাৎ—ছেঁড়া, আর সেই-খানে ক্যাম্প-খাটে বসে মীর ভয়ে কাঁপ্‌ছে ঠক্ ঠক্ করে। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"ব্যাপার কি?"

মীরা জবাব ক'রলে,—"কিছুই জানি না, অঘোরে ঘুমোচ্ছিলুম। হঠাৎ একটা ঝাঁকানি খেয়ে জেগে দেখি কতকগুলো বাঁদর মিলে খাট স্থদ্ধ আমাকে তুলে নিয়ে চলেছে—সঙ্গে আমার সেই ভাই। সেই সময়ে এরা দু'জন ছুটে এসে প'ড়তে, খাটখানাকে এইখানে ফেলে, তারা রুখে দাঁড়ালো, কিন্তু পালালো না। সেই সময়ে পাশ থেকে আবার আমার ভাই এলো আমাকে ধ'রতে। বেজায় ভয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম। তার পরেই আপনি এসে পড়েছেন।"

ঝপ্‌সি বল্লে—"হামারা লাঠি ছিন্ লিয়া, হুজুর!"

হররাজ বল্লে—"হাম্‌কো এত্তা বড়া পথর্ লেকে মারণে আয়াথা, হাম্‌বি লাক্‌ড়ি চালায়া, লাগা নেহি, হুঠ্‌কে খাড়া হুয়া। পিছু আপ্‌কো বন্দুক দেখ্‌কে ভাগা।"

"নেহি ভাগা, উ পাহাড়পর জমা হোতা, দেখিয়ে!"

ব'লে, ঝপ্‌সি সেই ঢিবিটার দিকে দেখিয়ে দিলে। অরবিন্দ আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে, বাস্তবিকই ছায়ার মতো অস্পষ্ট কতকগুলো চেহারা গিয়ে জম্‌ছে সেইখানে। তাড়াতাড়ি বন্দুক তুলে বার দুই সেই দিকে গুলি ক'রলে।

পরক্ষণেই চেহারাগুলো সেখান থেকে অদৃশ্য হলো। মীরা একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বল্লে—"ওঃ, কি সাংঘাতিক কাণ্ড! ওদের রাগ এখনো যায়নি।"

"হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় অন্য কারণ আছে।"

"আর কি কারণ ?"

অরবিন্দ ভেবে বল্লে—"দেখ, তোমার ভাই এখন পশুর ধর্ম্ম —পশুর স্বভাব পেয়েছে। কিন্তু মানুষ তো, ভগবানের দেওয়া রক্তের টান যাবে কোথায় ? তোমাকে দেখে অবধি ওর মনে বোধ করি কেমন একটু আকর্ষণ জেগেছে, ও তা বুঝতে না পারলেও, কিছুতে সরে যেতে পারছে না, সেই টানে পড়ে, তোমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টাতে দল নিয়ে পেছনে-পেছনে ঘুরছে।"

"ওঃ—বাবারে ! বলেন কি ! তা'হলে তো আর আমার—"

"এখানে থাকা—মোটেই নিরাপদ নয়। তাই আমিও ভাবছি যে, তোমাকে আজই নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসবো। আর যখন ঠিক খবর পাওয়া গেলো, তখন তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে তোমাদের এ্যাটর্ণীকে খবর দেওয়া উচিত। এক্লা কোন শিকারীই ওকে এদের কাছ থেকে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। তিনি যদি রীতিমতো বন্দোবস্ত করে, লোক-জন সঙ্গে দিয়ে অন্ততঃ আর একজন ভালো শিকারী এখানে পাঠাতে পারেন, তা'হলে আমি তোমার ভাইকে ধরে নিয়ে যাবার ভার নিতে পারি।"

ব'লে অরবিন্দ কথা শেষ ক'রলে। তারপর সেই দিনেই দু'পরের আগে সেখান থেকে তাঁবু তুলে, মীরাকে নিয়ে চল্লো নাগাপত্তনের পথে।

## দশ

মাইল চারেক যাবার পরে হঠাৎ কেমন একটা এক ঘেয়ে সুরের মতো মৃদু আওয়াজ, সাম্‌নের দিক থেকে ক্রমেই এগিয়ে আস্‌তে লাগলো তাদের দিকে। শেষে সমস্ত আকাশ-বাতাস ভরে গেলো—ঝড়ের মতো—বোঁ-বোঁ সুরে !

পাশে—অল্প দূরেই—একটা টিলা ছিলো। অরবিন্দ মীরাকে নিয়ে ছুটে গিয়ে উঠ্‌লো তার ওপরে। দু'জনেরই নজরে পড়্‌লো,—দূরে, সামনের দিকের আকাশ অনেকখানি ছেয়ে ফেলে, একখানা কালো মেঘ যেন হু হু করে ছুটে আস্‌ছে তাদের দিকে। মীরা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—

"দেখুন, দেখুন, জানোয়ারেরা অমন করে ভয়ে ছুটে-পালাচ্ছে কেন ?"

মেঘখানা কাছে এসে পড়তে, অরবিন্দ ব্যস্ত হয়ে মীরার হাত ধরে প্রায় টেনে নামিয়ে এনে, ঠেলে শুইয়ে দিয়েই, নিজে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ব'ল্লে—"বুঝতে পারছোনা ও মেঘ নয়—পাহাড়ের

বড়-বড় সাংঘাতিক মৌমাছির ঝাঁক। নিশ্চয়ই কেউ ওদের চাক ভেঙেছে, ওরাও বিষম রেগে তাড়া করে ছুটেছে। ওদের বিষে রক্ষা নেই, তাই জানোয়ারগুলো পর্য্যন্ত ভয়ে পালাচ্ছে। চুপ করে নিসাড়ে পড়ে থাকো।”

অরবিন্দের কথা ফুরোবার সঙ্গে-সঙ্গে মৌমাছির বিশাল ঝাঁক—আকাশ অন্ধকার ক'রে—এসে পড়লো তাদের ওপরে। জোর ভোঁ-ভোঁ সুরে অন্য সকল শব্দ চাপা পড়ে গেলো। দু'জনে তেমনি শুয়ে রইলো মড়ার মতো কাঠ হয়ে।

প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে মৌমাছির ঝাঁক আস্তে আস্তে পেরিয়ে চলে গেলো, তাদের সেই একঘেয়ে সুর আবার ক্ষীণ—অস্পষ্ট হয়ে এলো। মীরা আর অরবিন্দ উঠে খুঁজতে লাগলো চাকর দু'জনকে।

একটু পরেই ঝপসি হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটে এসে বল্লে—“জল্‌দি আইয়ে হুজুর, লাল বন্দর হররাজ কো ঘিরা হ্যায়।”

অরবিন্দ বন্দুক নিয়ে তার সঙ্গে ছুটে গিয়ে দেখলে, টিলাটার অন্য দিকের গোড়াতে একটা খানার মতো জায়গাতে হররাজ দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় পাথর উঁচু করে বাগিয়ে ধরে, আর সেই লাল বাঁদরের দলটা—হাত দশেক তফাতে—প্রায় গোল হয়ে তাকে ঘিরে রয়েছে।

দেখেই অরবিন্দ ওপোর-ওপোর এলোপাথাড়ি গুলি ক'রলে তিন-চার বার, কিন্তু লাগলোনা একটাকেও। বাঁনরগুলো

তখুনি পালিয়ে গেলো। কিন্তু একটার দিকে দেখিয়ে ঝগ্গি চেঁচিয়ে উঠলো— ওই হুজুর আদ্‌মি-বন্দর—আদ্‌মি-বন্দর!

মীরা ততক্ষণে ছুটে এসে কাছে দাঁড়িয়েছিলো, ভয়ে বলে উঠলো—"ওঃ কি ভয়ানক, এখান পর্য্যন্ত পেছনে-পেছনে এসেছে কিন্তু আমরা মোটেই জানতে পারিনি।"

অরবিন্দ একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"এইবার আমার কথা সত্যি কিনা দেখ, তোমার ওপর ওর যে স্বাভাবিক প্রাণের টান পড়েছে, তাতেই সঙ্গে-সঙ্গে আস্‌ছে। এই অঞ্চলটা পেরিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত ওদের হাত আমরা কিছুতেই এড়াতে পারবো না।"

বাস্তবিকই, তার পরের দিন পর্য্যন্ত সেই বাঁদরগুলোর সাড়া পাওয়া যেতে লাগলো। তারপরে তারা যখন সে অঞ্চলটা পার হয়ে গেলো, তখন অরবিন্দ আরামের নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"আর ভয় নেই, এইবার তুমি নিরাপদ। এখন সহরে পৌঁছে শীগ্‌গির তোমাদের এ্যাটর্ণীকে লোক পাঠাতে বলো, কে জানে ওরা বেশী দিন এখানে থাক্‌বে কি না?"

—শেষ—